ভাষান্তর ॥ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যা

প্রকাশক ॥ রেণুকা সাহা ২০ কেশবসেন স্ট্রীট . কলকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর ॥ নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স ৪/১ই বিডন রো কলিকাতা ৭০০০০৬

সম্পত্তির সামাজিক রূপান্তরকরণ ও
আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা বিশ্বব্যাপী
সংগ্রাম করছেন তাদের উদ্দেশে

প্রকাশকাল ॥ ভাদ্র ১৩৬৫

প্রচ্ছদমুদ্রন ॥ স্পেকট্রাম ১৭ মনীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা ৭০০০০৯
প্রচ্ছদপট ॥ আন্তেন্ত রঁ্যাবার 'পোর্ট্রেট অফ এ ম্যান উইথ ব্রোকেন নোজ'
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য জেলিয়াপাড়া লেন কলিকাতা ৭০০০১২

॥ পর্যায় সরণী ॥

PAUL LAFARGUE

EVOLUTION OF PROPERTY FROM SAVAGERY TO CIVILIZATION

সম্পত্তির বিবর্তন

বর্বরযুগ থেকে সভ্যযুগ

পল লাফার্গ

দীপায়ন
২০ কেশব সেন স্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০,০০৯

দীপায়নের অন্যান্য প্রকাশনা

চার্লস ডারউইন

ডিসেণ্ট অফ ম্যান

রমেশচন্দ্র দত্ত

পিজ্যানন্টি অব বেঙ্গল

লুইস হেনরী মর্গ্যান

এনসিয়েনট সোসাইটি

(দুই খণ্ডে)

গোলাম কুদ্দুস

একসঙ্গে

লুইজি বার্তোলিনী

বাইসাইকেল থিফ

"সমাজের অর্থনীতিক কাঠামোই হলো প্রকৃত বনিয়াদ যার উপর গড়ে ওঠে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রিক উপরিকাঠামো, আর এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জন্ম নেয় চিন্তা-ভাবনার নির্দিষ্ট সামাজিক ধরন। এককথায়, উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে জীবনের সামাজিক, রাজনীতিক ও মননগত চরিত্রকে নির্ধারণ করে।"

কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল।

"সম্পত্তির ধারণার বিবর্তন সংক্রান্ত সুস্পষ্ট জ্ঞানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মানবজাতির চিন্তাধারার ইতিহাসের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যময় অংশটি প্রকাশ পায়।"

লুই হেনরি মর্গান, এনসিয়েন্ট সোসাইটি

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সম্পত্তির সমকালীন রূপগুলি

পুঁজি, অর্থাৎ বর্তমানে সম্পত্তির যেটা প্রধান রূপ, হচ্ছে চিরন্তন—আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ববিদরা এই ব্যাপারটাকে একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। প্রচুর কসরৎ করে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে পুঁজি প্রায় পৃথিবীর সমবয়সী, এবং যেহেতু এর কোন সূচনা নেই, সুতরাং এর কোন সমাপ্তিও থাকতে পারে না।[১] এই বিস্ময়কর দাবীটির সমর্থনে আর্থ-রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় গ্রন্থে খুবই আত্মপ্রসাদের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হয়েছে এক আদিম মানুষের গল্প : মানুষটির একজোড়া ধনুক ছিল, তার একটা সে ধার দিল ভাইকে, এবং ঠিক হল যে ঐ ভাইটির শিকারের একটা অংশ সে পাবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পুঁজিবাদী সম্পত্তির অস্তিত্ব অনুসন্ধানের কাজে অর্থনীতিবিদরা এতটা উদ্দীপনা ও উৎসাহ প্রয়োগ করেছিলেন যে এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা মানব প্রজাতির বাইরে, এমনকি অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও সম্পত্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। যেমন পিঁপড়েরা তাদের দূরদৃষ্টির দরুন, খাদ্য মজুত করে। আহা, আর এক কদম আগ বাড়িয়ে কেন তাঁরা বলে দিলেন না যে আসলে পিঁপড়েরা খাদ্য মজুত করে সেটাকে বিক্রি করার জন্য এবং নিজের পুঁজি সঞ্চালনের মারফৎ কিছু মুনাফা লোটার মতলবে।

১ পুঁজি বলতে বোঝানো হয় এমন কিছু যা একটা বর্ধিত আয়ের জন্ম দেয়। যেমন, কিছু পরিমাণ টাকা ধার দেওয়া হল, যা মাস বা বছরের শেষে কিছু মুনাফার সৃষ্টি করল ; চাষবাস করা কিছুটা জমি, কিম্বা সত্বাধিকারী কর্তৃক নয়, তার বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের শ্রমোৎপাদিত কোন উপকরণ। কিন্তু কৃষক বা তার পরিবার কর্তৃক কর্ষিত জমি, শিকারীর বন্দুক, ছুতোরের র‍্যাঁদা বা হাতুড়ী—এগুলিও সম্পত্তি, কিন্তু পুঁজিবাদী সম্পত্তি নয়। কেননা অন্যদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করার বদলে এগুলির মালিকরা এগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ব্যবহার করে। আপন শ্রমহীন মুনাফার ধারণাটি পুঁজি অভিধাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

কিন্তু পুঁজি চিরন্তন এই ধারণাটি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। পুঁজি (ক্যাপিটাল) এই অভিধাটিও যে বরাবরই বিদ্যমান— তাঁরা এটা কোথাও দেখাননি। জাহাজের প্রতিটি দড়িরই একটা যথাযথ নাম থাকে, একমাত্র ঘণ্টা বাজানোর দড়িটি ছাড়া। আর্থরাষ্ট্রনীতির আওতায় পরিভাষার এতই অভাব যে পুঁজির মত এত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বস্তুর কোন নাম ঠিক করা যাবে না—এটা মেনে নেওয়া যায় না। তবু, আধুনিক অর্থে পুঁজি (ক্যাপিটাল) অভিধাটিকে কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকহিতৈষণা (ফিল্যানথ্রপি) শব্দটির (অর্থাৎ, পুঁজিবাদী শাসনের পক্ষে মানানসই মানবতাবাদী ভণ্ডামি) ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একই। এবং ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদী সম্পত্তি নিজেকে সংহত করতে শুরু করে ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অর্জন করে। পুঁজির এই সামাজিক প্রাধান্যই ফরাসী বিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল। এই বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্যতম হলেও, আদতে এটি ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব, সমতা, ন্যায় ও দেশপ্রেমের চলতি বুলির সাহায্যে, আর এইসব গৎগুলিকে বুর্জোয়ারা পরবর্তীকালে ব্যবহার করেছে নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক উদ্যোগকে সম্প্রসারিত করার কাজে। ফরাসী বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদীরা সবেমাত্র মাথা তুলছে সমাজে, আর সেই কারণেই সেবাস্তিয়েঁ মার্সিয়ে তাঁর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "নতুন শব্দাবলীর অভিধান"-এ (Dictionaire de mots Nouveaux) capitaliste শব্দটিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। শব্দটির সঙ্গে তিনি এই বিচিত্র সংজ্ঞাটি যুক্ত করেন : "Capitaliste : শব্দটি প্যারি শহরের বাইরে প্রায় অজানা। এর অর্থ হল এক সম্পদশালী দানব, হৃদয় যার লোহায় গড়া, ধাতব বস্তু ছাড়া আর কিছুতে যার কোন অনুরাগই নেই। ভূমি-কর বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে যান—হেসে উঠবে সে ; এক ইঞ্চি জমিও যে নেই তার, কাজেই করের প্রশ্ন ওঠে কী করে ? যে আরবরা মরুভূমির ক্যারাভান লুঠ করে এবং অন্য দস্যুদের ভয়ে মাটির নিচে সোনাদানা পুঁতে রাখে, ঠিক তাদের মতই পুঁজিপতিরা লুকিয়ে ফেলে আমাদের সমস্ত অর্থকড়ি।"

১৮০২ সালেও মানবজাতি প্রগাঢ় সম্মানের সেই অনুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি আজকের দিনে যেটা পুঁজিপতিদের দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছে।

ক্যাপিটাল অভিধাটির উৎস লাতিন হলেও, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় কিন্তু এর কোন সমতুল শব্দ নেই। এই ধরণের সমৃদ্ধ ভাষার ভাণ্ডারে শব্দটির অনস্তিত্ব

প্রমাণ করে যে প্রাচীন যুগে পুঁজিবাদী সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না, অন্তত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় হিসাবে তো নয়ই।

পুঁজি অভিধাটির সঙ্গে সম্পত্তির যে রূপটি সঙ্গতিপূর্ণ, সেটি বিকশিত হয়েছিল এবং সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর। দ্বাদশ শতাব্দীর পর ইউরোপের উত্তাল আর্থনীতিক ও রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাণরস ছিল এটাই। এই বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রাণধারা যুগিয়েছিল বিভিন্ন ঘটনাবলী—আমেরিকা আবিষ্কার, উত্তমাশা অন্তরীপ ছুঁয়ে ভারতবর্ষে যাওয়ার পথ আবিষ্কার, আমেরিকা মহাদেশ থেকে বহুমূল্য বিভিন্ন ধাতুসম্পদ আমদানী, কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ অধিকার, মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ইওরোপের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির শাসকদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন ও পারিবারিক আত্মীয়তা এবং সাধারণ স্বার্থে সংযুক্তির ফলে উদ্ভূত বিশাল বিশাল সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য। এইগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য কারণসমূহ একযোগে পুঁজিকে দ্রুত বর্দ্ধমান করেছে। পুঁজি—ব্যক্তিগত সম্পত্তির যাবতীয় রূপের মধ্যে সবথেকে নিখুঁত ও সংহত, আর নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে পুঁজিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বশেষ রূপ। পুঁজির এই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আবির্ভাবই সবথেকে ভালভাবে প্রমাণ করে যে সম্পত্তি কোন অপরিবর্তণীয় অহস্তান্তর যোগ্য বস্তু নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ, যাবতীয় বস্তুগত ও মননগত বিষয়ের মতই তা অবিরাম বিবর্তিত হয়, নানান রূপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রূপগুলির একটির থেকে অপরটির পার্থক্য থাকে ঠিকই, কিন্তু আবার একটি রূপ থেকে অপরটি উদ্ভূত ও বিকশিত হয়।

বিভিন্ন সময়ে সম্পত্তি বিভিন্ন চেহারা নিয়েছে। আমাদের সমাজে একে ভিন্নভিন্ন রূপে দেখা যায়। এগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

১. সার্বজনীন সম্পত্তির রূপ

ক) প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা সার্বজনীন সম্পত্তি: যেমন গোষ্ঠীগত জমি, শত শত বছর ধরে যা অভিজাত ও বুর্জোয়াদের অবৈধ অধিকারভুক্ত।

খ) আধুনিক কালের সার্বজনীন সম্পত্তি: রাষ্ট্র এগুলির পরিচালক, এগুলিকে চিহ্নিত করা হয় জন-কৃত্যক নামে (টাঁকশাল, ডাকঘর, সার্বজনীন রাস্তা, জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর ইত্যাদি)।

২. **ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপ**

ক) ব্যক্তিগত উপভোগের সম্পত্তি
খ) সম্পত্তি – শ্রমের উপকরণসমূহ
গ) সম্পত্তি – পুঁজি

(ক) ব্যক্তিগত উপভোগের সম্পত্তি

এটা শুরু হয় খাদ্য থেকে, যা একজন খায়। তারপর আসে পোষাক-পরিচ্ছদ, বিলাসদ্রব্য (আংটি, মণিমুক্তো প্রভৃতি), অর্থাৎ যে সব জিনিস দিয়ে মানুষ নিজেকে আচ্ছাদিত ও সজ্জিত করে। একসময় বাড়িও ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই শাখাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মানুষের নিজস্ব আবাস থাকত, তা সে বিশাল শ্বেত পাথরের প্রাসাদ বা খোড়ো কুঁড়ে যা-ই হোক না কেন, ঠিক যেমন কচ্ছপের সাথে থাকে তার খোলা। শিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সভ্যতা অসংখ্য বিলাস-দ্রব্যকে গরীব মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে যা এককালে ধনীরাই কেবলমাত্র ব্যবহার করতো আবার অন্যদিকে যা একই সঙ্গে গৃহচ্যুত করেছে বিপুল সংখ্যক মানুষকে। তারা বাধ্য হয় ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে বা সাজানো-গোছানো ঘরে বাস করতে। এক নজিরবিহীন সম্পদরাশির মাঝে দাঁড়িয়ে সেই সম্পদের স্রষ্টাদের এই সভ্যতা বেঁধে রেখেছে ব্যক্তিগত ভোগের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পত্তিতে।

পুঁজিবাদী সভ্যতা বর্বরদের থেকেও হীন এক জীবনযাপনের অবস্থায় দিন গুজরান করতে বাধ্য করেছে সর্বহারা শ্রেণীকে। বর্বররা অপরের ভোগের জন্য শ্রম করে না—এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে সরিয়ে রেখে, শুধুমাত্র খাদ্যের প্রশ্নটিকেই এখানে বিচার করা যাক। এই বর্বররাই ইওরোপ আক্রমণ করে দখল করেছিল এবং সেখানে বসবাসও করেছিল তারা। তাদের শুয়োর এবং অন্যান্য পশুর পাল ছিল, শিকার করার জন্য হাতের নাগালে ছিল প্রচুর জন্তু-জানোয়ারপূর্ণ বিশাল অরণ্যভূমি, মাছ ধরার জন্য ছিল সমুদ্র আর নদী। যদিও পোশাক পরিচ্ছদ তাদের ভাল ছিল না, বন্য পশুর চামড়া আর বিশ্রীভাবে বোনা কিছু পোশাকই ছিল সম্বল। তবুও আজকের এই সর্বহারা শ্রেণীর তুলনায় বেশি পরিমাণ প্রাণীজ খাদ্য আহার করত ঐ বর্বররা। এ যুগের সর্বহারাদের পরণে থাকে উন্নত যন্ত্রে উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত নিকৃষ্ট জামা-কাপড়, যা প্রকৃতির নির্মমতা প্রতিরোধে বড় অসহায়। আজকের সর্বহারার জীবন তুলনায় অনেক বেশি কঠিন, কারণ প্রকৃতির নির্মমতার সামনে তার শরীর বর্বর মানুষের শরীরের থেকে অনেক দুর্বল, অনেক অনভ্যস্ত। নিম্নলিখিত তথ্যটা অসভ্য মানুষের শক্তিমত্তার একটা

ধারণা দেয়। ইওরোপের প্রাগৈতিহাসিক কবরস্থানগুলোতে কিছু করোটি আবিস্কৃত হয়েছে। সেইসব করোটিতে ছিদ্র করার এবং করাত দিয়ে অস্ত্রোপচারের দাগ রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদরা প্রথমে এই করোটিগুলিকে মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ জাতীয় মনে করে এই সিদ্ধান্ত খাড়া করেছিলেন যে মৃত্যুর পর ওগুলিতে ছিদ্র করা হয়েছে। কিছু করোটিকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করে ব্রকা কিন্তু দেখিয়ে দেন যে, মৃতদেহের ওপর ঐ প্রকার অস্ত্রোপচার করা হয়নি। শুকনো ক্ষতের চিহ্ন ছিল, ঐ করোটিগুলিতে, অস্ত্রোপচারের সময় মানুষটি বেঁচে না থাকলে যে চিহ্ন থাকা সম্ভব নয়। ব্রকার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠে। বলা হয়—ব্রোঞ্জ আর পাথরের সেই আদিম যন্ত্রপাতি দিয়ে অত জটিল অস্ত্রোপচার অজ্ঞ বর্বরদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। উন্নত শিক্ষা, চমৎকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও ঐ ধরণের অস্ত্রোপচারকে আধুনিক চিকিৎসকরা এখনও বিপজ্জনক বলে মনে করেন। কিন্তু আজ যাবতীয় সন্দেহ অপসৃত। এখন সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে আদিম মানুষরা অত্যন্ত নিপুণভাবে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করে থাকে। আজকের দিনের বর্বররাও খোলা আকাশের নিচে এই ধরণের অস্ত্রোপ্রচার করে। ইওরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছেন—অস্ত্রোপচারের কয়েকদিন পরেই মানুষটি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, শুরু করেছে নিজের কাজ, যেন কিছুই হয় নি তার। হয়ত করোটির একটা অংশকে চেঁচেই ফেলতে হয়েছে কারণ এই অস্ত্রোপচার করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল। সভ্য মানুষদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষত মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করে, অথচ আদিম মানুষরা ঐ ক্ষত আরোগ্য করে অত্যন্ত দ্রুত, একান্তই অনায়াসে। সভ্যতা দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয় সভ্য মানুষের শারীরিক, হয়ত বা মানসিক হীনম্মন্যতাকে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এর জন্য শিক্ষার দরকার, যে শিক্ষা শুরু করতে হবে একেবারে শৈশব থেকে, আর চলবে সারা জীবন জুড়ে। কয়েক প্রজন্ম ধরেই চালিয়ে যেতে হবে এই শিক্ষার ধারা। তবেই ভবিষ্যতের মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে আদিম ও বর্বর যুগের মানুষদের চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠতা ও শারীরিক দক্ষতা।[১] মর্গান হচ্ছেনসেই বিরল নৃতাত্ত্বিকদের অন্যতম, যাঁরা আদিম ও বর্বর-

১। সিজার—যার নিবিড় অনুভূতিপ্রবণ পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পর্কে আজকের প্রাবন্ধিকরা একমত, তিনি জার্মান বর্বরদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কখনও তাদের দৈহিক শক্তি ও রণদক্ষতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাদের শক্তিমত্তা ও বীরত্ব সম্বন্ধে এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন তিনি যে ভার্সিন্‌-জেটরিক্সের নেতৃত্বে গল্‌দের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দমন করার জন্য রাইন নদীর

যুগের মানুষদের সম্বন্ধে ফিলিস্তাইন্‌দের দ্বারা প্রচারিত অবজ্ঞা ও অপপ্রচারকে কখনো সমর্থন করেননি। বর্বর জাতিগুলির বিষয়ে সঞ্চিত সুপ্রচুর এবং প্রায়শই পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলিকে তিনিই প্রথম যুক্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীবিন্যস্ত করেন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিবর্তনের প্রথম রূপরেখা খোঁজার পথেও তিনিই প্রথম যাত্রী। মর্গান লিখেছেন, "চূড়ান্ত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এটা হয়ত অসম্ভব নয় যে বন্য (savagery) যুগে মানবজাতির প্রগতি—সামগ্রিক মানব-প্রগতির নিরিখে—বর্বরযুগের (barbarism) তিনটি উপ-যুগের থেকে মাত্রার ক্ষেত্রে অধিক ছিল, এবং একইভাবে, সমগ্র বর্বরযুগের প্রগতি সমগ্র সভ্য যুগের থেকে মাত্রার ক্ষেত্রে অধিক ছিল।"[২] সভ্য সমাজে এসে বসবাসকারী কোন বন্য বা বর্বর অবস্থার মানুষ এক নিদারুণ অবস্থায় উপনীত হয়: জন্মগত ভাল গুণগুলি হারিয়ে ফেলে সে, আক্রান্ত হয় সভ্য মানুষদের ব্যাধিতে, আর অর্জন করে তাদের কদভ্যাসগুলি। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ এবং স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলে এই বর্বর মানুষরাই বস্তুগত ও মননগত বিকাশের কত উচ্চ মাত্রায় পৌঁছতে পারে—গ্রীস ও মিশরের ইতিহাসই তা দেখিয়ে দেয়।

সভ্যযুগে স্বাধীন উৎপাদকের হাতে থাকে শুধু তার একান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাটুকু মেটানোর মত নিম্নতম ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কারণ নিজেদের চূড়ান্ত অমিতব্যয়ী খামখেয়াল পূরণের জন্য উৎপাদনের অপর্যাপ্ত উপায়গুলি পুঁজিপতিদের করায়ত্ত। নিজের দেরাজে জমে থাকা সমস্ত টুপি আর জুতো পরতে হলে গ্রীক পুরাণের হেকটন্‌শিরির মত একশত মাথা আর একশত পা থাকা দরকার পুঁজিপতির! যদি সর্বহারারা কষ্ট পায় কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকার দরুণ তাহলে অন্যদিকে পুঁজিপতিরা শেষ হয় অতি-প্রাচুর্যে জীবন কাটিয়ে। তাদের ওপর চেপে বসে এক অবসাদ, যে রোগ তাদের ক্ষইয়ে দেয়, গোটা জাতটাকে অধঃপতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ-সবই আসলে উপভোগের উপায় ও উপকরণের অতিপ্রাচুর্যের ফল।

পথে তিনি জার্মানীতে অশ্বারোহী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী পাঠান। ঐ বাহিনী জার্মান বর্বরদেরও সাথে নেয়। কিন্তু এই বর্বরদের ঘোড়াগুলি ভাল না থাকার দরুণ সামরিক নেতা, নাইট ও বর্ষীয়ানদের কাছ থেকে ভালো ঘোড়াগুলি নিয়ে সেগুলিকে তিনি ঐ জার্মান বর্বরদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।—"De Bello Gallico," ৭, ৬৫.

২ লুই মর্গ্যান, "এন্‌সিয়েন্ট সোসাইটি", খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৩, "মানব প্রগতির অনুপাত"।

(খ) শ্রমের উপকরণস্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ফ্রাঙ্কলিন্-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ হচ্ছে এক যন্ত্র-নির্মাণকারী প্রাণী। যন্ত্র-নির্মাণই মানুষকে তার পূর্বসূরী অর্থাৎ অমানুষদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করে। বানরেরা লাঠি ও পাথর ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব, যে পাথর থেকে বানিয়েছে হাতিয়ার, বানিয়েছে নানান উপকরণ। তাই কোন গুহায় বা ভূতাত্ত্বিক স্তরে কোন পাথুরে উপকরণ আবিষ্কৃত হলে নিশ্চিতভাবেই সেখানে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, নরকঙ্কাল যেমন প্রমাণ দেয় মানুষের উপস্থিতি। শ্রমের উপকরণগুলি, আদিম মানুষের পাথুরে ছুরি, ছুতোরের রাঁদা, শল্যচিকিৎসকের ছুরিকা, শারীরবিদের অনুবীক্ষণযন্ত্র অথবা কৃষকের লাঙল—এ-সবই মানুষের একটা বর্দ্ধিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা তার চাহিদা-পূরণকে সহজতর করে।

মামুলী হস্তচালিত শিল্প যতদিন টিকে থাকে, স্বাধীন উৎপাদক ততদিন পর্যন্ত নিজের শ্রমের উপকরণের মালিক থাকে। মধ্যযুগে ঠিকা মজুররা তাদের যন্ত্রপাতির থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, কথনো সেটাকে কাছছাড়া করত না; ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, আঞ্চলিক বিভাজনের ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য যে ভূখণ্ডটুকু বরাদ্দ করা হত, তার সাময়িক মালিক হত তারাই। মধ্যযুগীয় ভূমিদাসরা যে জমিতে চাষ করত, তার সঙ্গে তাদের এতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতো যে ঐ জমি আর ভূমিদাস যেন অবিচ্ছেদ্য।

শ্রমের উপকরণে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নানান অবশেষ এখনো রয়ে গেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অতি দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে। যে সব শিল্পে যন্ত্রপাতির প্রসার ঘটেছে, সেখানে ব্যক্তিগত উপকরণগুলি আর শ্রমিকদের হাতে নেই। তার জায়গায় এসেছে যান্ত্রিক উপকরণসমূহ, শ্রম উৎপাদনের এক যৌথ উপকরণ যা এখন আর শ্রম উৎপাদকের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। মানুষকে তার নিজস্ব সম্পত্তি অর্থাৎ যন্ত্রপাতি থেকে বঞ্চিত করেছে পুঁজিবাদ। নিজের জন্য মানুষ তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে প্রথম যে নিখুঁত যন্ত্র বানিয়েছিল, সেটাই তার কাছ থেকে প্রথমে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বন্যমানুষরা তার নিজের তীর-ধনুকের মালিক। এগুলি একই সঙ্গে তার অস্ত্র ও যন্ত্র—ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে নিখুঁত। সৈনিকই হচ্ছে প্রথম সর্বহারা, যার যন্ত্র অর্থাৎ অস্ত্র, কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন যে সরকার তাকে চাকরি দেয়, সেই সরকারই তার অস্ত্রের মালিক।

সর্বহারা শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে একেবারে নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে এনেছে পুঁজিবাদী সমাজ। স্বাধীন উৎপাদককে শেষ না করে তার পক্ষে আর

এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না, যদিও এই উৎপাদকরাই হচ্ছে পুঁজিপতিদের সোনার-ডিম-পাড়া হাঁস। পুঁজিবাদী সমাজ স্বাধীন উৎপাদককে ধ্বংস করতে এবং তার শ্রমের উপকরণগুলিকে কেড়ে নিতে চায়। এই লুণ্ঠন এখন ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এক অতি বাস্তব সত্য।

(গ) সম্পত্তি পুঁজি।

আধুনিক সমাজে সম্পত্তির পুঁজি রূপটিই সম্পত্তির নিজস্ব রূপ। পূর্বতন কোন সমাজেই সার্বজনীন বা নির্দ্ধারক বিষয় হিসাবে এটি বিদ্যমান ছিল না।

সম্পত্তির এই রূপটির অত্যাবশ্যক শর্ত হল স্বাধীন উৎপাদককে শোষণ করা। প্রতি ঘণ্টায় সে যে মূল্য সৃষ্টি করে, তার একটা অংশ তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়; এই বিষয়টিকে অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণ করেছিলেন মার্কস। পণ্য উৎপাদন, যা উৎপাদনের একটি রূপ, হচ্ছে পুঁজির ভিত্তি। এখানে মানুষ উৎপাদন করে বাজারের কথা মনে রেখে—শ্রমিকের ভোগের কথা ভেবে নয়, অথবা নিজের সামন্ত প্রভু বা দাসমালিক প্রভৃতির ভোগের জন্যও নয়। পূর্বতন সমাজগুলিতে মানুষ কেনা-বেচা করত, কিন্তু সেখানে বিনিময় করা হত শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত জিনিসপত্রগুলিই। ঐ সব সমাজেও মেহনতকারীরা, ক্রীতদাস বা ভূমিদাসরা, শোষিত হত—একথা সত্য, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে মালিকের অন্তত কিছুটা দায় থাকতোই; যেমন, কাজ করুক আর নাই করুক, দায়স্বরূপ মনুষ্যরূপ জন্তুটিকে আহার যোগাতে বাধ্য থাকত দাসমালিক। আজকের পুঁজিপতি সমস্ত দায় থেকে মুক্ত, যাবতীয় দায় এখন স্বাধীন শ্রমিকের নিজেরই। বৃদ্ধ এবং কাজে অক্ষম দাসদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিষণ্ণ নীতিবাগীশ ক্যাটো; আর তাই দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ভালমানুষ প্লুটার্ক। আজকের দিনের পুঁজিপতিরা কী করে? যে শ্রমিকরা তাকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে তারাই থাকে অনাহারে বা মারা যায় কারখানাতেই। পুঁজিপতি নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। এই ঘটনা দেখলে প্লুটার্ক কী বলতেন? ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে গিয়ে স্বাধীন উৎপাদকের মুক্তি অর্জন করা কিন্তু পুঁজিপতিদের লক্ষ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল পুঁজির মুক্তি। শ্রমিকদের সম্বন্ধে যাবতীয় দায় থেকে পুঁজিকে মুক্ত করার দরকার ছিল। একমাত্র সম্পত্তির এই পুঁজি রূপটি বলবৎ থাকার সময়ই মালিক সমস্ত রকমে একে ব্যবহার ও অপব্যবহার করতে পারে।

আধুনিক সমাজে এইগুলিই হচ্ছে সম্পত্তির বিদ্যমান রূপ। এই রূপগুলিকে ভাসাভাসা ভাবে বিচার করলেও বোঝা যায়—এগুলির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যেমন, একদিকে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা গোষ্ঠীগত সম্পত্তি

রূপান্তরিত হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, আবার অন্যদিকে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী সম্পত্তি পরিবর্তিত হচ্ছে রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত সার্বজনীন সম্পত্তিতে। কিন্তু এই চূড়ান্ত রূপটি অর্জন করার আগে, স্বাধীন উৎপাদকের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতিগুলি কেড়ে নেয় পুঁজি, এবং সৃষ্টি করে শ্রমের যৌথ উপকরণ।

তাহলে বোঝা গেল যে সম্পত্তির সমকালীন রূপগুলি এক নিরন্তর পরিবর্তন ও বিবর্তনের স্তরে রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে সম্পত্তি অতীতেও কোন স্থায়ীরূপে ছিল না এবং প্রকৃত রূপটিতে পৌছনোর আগে তাকে নানান স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এক সময় এই রূপটিও পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং অন্য কোন নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

*　　　　　*　　　　　*

এই প্রবন্ধে আমি সম্পত্তির পুঁজির রূপে পৌছনোর পূর্ববর্তী বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি। চেষ্টা করেছি ইতিহাসকে আংশিক পুনর্নির্মিত করতে। এই পুনর্গঠনের কাজে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, মূল বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করার আগে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।

জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের একই স্তরের মধ্য দিয়ে যায়। নানান বয়সে তারা বৃদ্ধি, পূর্ণতা ও ধ্বংসের একই সঙ্কটের মুখোমুখী হয়—অবশ্য জাতি, জলবায়ু এবং জীবন-ধারনের অবস্থা অনুযায়ী এই অভিজ্ঞতার সামান্য হের-ফের হয়। একই ভাবে, বিভিন্ন স্থানের মানব-সমাজও একই সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপের মধ্যে দিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে সাযুজ্যপূর্ণ ভাবধারা। ভিকোকে "ইতিহাসের দর্শন" এর জনক বলা হয়। ঐতিহাসিক বিকাশের এই মহান নিয়মটি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

তাঁর "Scienza Nuova"-য় তিনি বলেছেন, "এক আদর্শ, চিরন্তন ইতিহাস" এর কথা, যে চিরন্তন ইতিহাস অনুযায়ীই সমস্ত রাষ্ট্রের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে। বন্যতা, হিংস্রতা অথবা বর্বরতার একই অবস্থা থেকে মানুষ এগিয়েছে গার্হস্থ্য জীবনের দিকে"।[১]

---

১. Una storia ideal, eterna, sopra la quale corrono in tempo le storie di tutti le naziono : ch'ovumque da tempi selvaggi, feroci e fleri comminciarno gli uomini ad addimesticarsi. (G.Vico, Principi di Scienza Nuova. De' Principi Libero Secondo, Section III. ed. di Ferrari. Mihano, 1837)।

কোন একটি জনগোষ্ঠীর বন্যতার দশা থেকে সভ্যতায় পৌছনোর ইতিহাস নির্ণয় করতে পারলে পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেরই পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ ইতিহাসের পুনর্নির্মান করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে, কেননা অগ্রগতির পথে কোন জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে যে সব স্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে, সঠিক পারম্পর্যে সেই পথে পুনরায় হাঁটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, কোন রাষ্ট্র বা জাতির জীবনের এই ইতিহাসকে একত্রিত করে পুনর্নির্মাণ করা না গেলেও, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে আমাদের হাতে যে বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলি রয়েছে, সেগুলিকে একত্রিত করে এই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ সম্ভবপর। মানবজাতির বয়স যতই বৃদ্ধি পায় সে পূর্বল্লেখিত পথেই নিজের শৈশবের ইতিবৃত্তকে বুঝতে শেখে।

সুসভ্য জাতিগুলির পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও অভ্যাস-আচরণ টিকে আছে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সভ্যতা পুরোপুরি এই সব জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে পারেনি। পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধের পণ্ডিত ও গবেষকরা বর্বর অবস্থার মানুষদের প্রথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও মানসিক ধারনা বিষয়ে নানান অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এর ফলে আমরা খুঁজে পেয়েছি এক অতীত, যে অতীতকে আমরা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেই আমরা সম্পত্তির সূচনা খুঁজে পেতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে যুক্তিসম্মতভাবে বিন্যস্ত করে সম্পত্তির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

১

আদিম সাম্যবাদ

মানবজাতির শৈশবকাল থেকেই পুঁজির অস্তিত্ব ছিল—এই কথা যে সব আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ববিদরা জোর দিয়ে বলে থাকেন, তাঁরা আদিম মানুষদের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁদের অপরিসীম অজ্ঞতাই শুধু এর দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন।[১]

এখনও পর্যন্ত এমন সব আদিম জনগোষ্ঠী টিকে আছে, যাদের ব্যক্তিগত বা যৌথ, কোন ধরনের স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। যে সব জিনিস তারা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে, বড়জোর সেগুলির ব্যক্তিগত মালিকানা সংক্রান্ত একটা ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কিছু অস্ট্রেলিয় জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে বোঝে তাদের শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু জিনিসপত্রকে। যেমন—শিকারের হাতিয়ার, কান, ঠোঁট বা নাকে লাগানো অলঙ্কার, পোষাক হিসাবে পশুর চামড়া, বাত সারানোর জন্য মানুষের চর্বি, বাক্সে-রাখা পাথর, শরীরে জড়ানো গাছের ছালের পোষাক ইত্যাদি। এইসব জিনিসপত্র তাদের ব্যক্তিগত অধিকার-ভুক্ত বা তাদের সঙ্গে এই জিনিসগুলি মিশে থাকে এক হয়ে। তাদের মৃত্যুর পর কেউ এগুলি নেয় না, মৃতদেহের সঙ্গেই এগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় বা পুঁতে দেওয়া হয়। একেবারে প্রাথমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থাকে—ব্যক্তির নাম। আদিম মানুষ কোন অপরিচিত লোকের কাছে কখনোই নিজের নাম প্রকাশ করে না; নাম তার কাছে এক মহামূল্যবান বস্তু, শুধু কোন

১। সুবিদ্বান অধ্যাপক হাক্সলে যিনি পুঁজিবাদের সমর্থক এবং রুশোকে নির্বোধ বলে গাল দেন, তিনি মিস্টার হার্বার্ট স্পেনসার-এর সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক কুখ্যাত আলোচনায় আদিম মানুষদের প্রথা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার এক স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ ঐ বিষয়টি নিয়ে তিনি কী বিজ্ঞের মতই না কথা বলে থাকেন! ১৮৯০-এর জানুয়ারী সংখ্যা 'নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী'তে এই সুবিদ্বান অধ্যাপকটি লিখেছেন, "জমি সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তি ছিল—এ-কথা একেবারেই ভুল"…"জমি ছিল ব্যক্তিগত বা কয়েকজনের সম্পত্তি, কখনই সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের সম্পত্তি নয়"।

বন্ধুকেই সেটা উপহার দেওয়া যায়। ব্যক্তির সঙ্গে তার নাম এতটাই অভিন্ন যে তার মৃত্যুর পর তার গোষ্ঠীর লোকেরা ঐ নামটি আর কখনও উচ্চারণও করে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠার জন্য কোন বস্তুকে অবশ্যই তার মালিকের শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, তা সে প্রকৃত অর্থেই হোক বা কাল্পনিকভাবেই হোক। আদিম মানুষ যখন কোন বস্তুকে তার নিজের ব'লে জানাতে চায়, তখন সে ঐ বস্তুটিকে জিভ দিয়ে চেটে নিজের অধিকার জাহির করে। একমাত্র সূঁচ ছাড়া অন্য যে কোন জিনিস কেনার পরই এস্কিমোরা সেটিকে নিজের মুখে দেয়, অথবা কোন প্রতীকি কাজের মাধ্যমে জিনিসটিকে পবিত্র করে নেয়। এর অর্থ হল যে সে ঐ জিনিসটিকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখতে চায়, আর এখান থেকেই সূচনা হয়েছে ট্যাবু-র।

একইভাবে, তৈরী-করা জিনিসপত্রেরও মালিক হওয়া যায় তখনই, যখন সেগুলি তার নিজের কাজে লাগে। তাই কোন এস্কিমো দু'টির বেশি ক্যানো রাখতে পারে না, তৃতীয় ক্যানোটি থাকে গোষ্ঠীর অধিকারে। মালিক যে সব জিনিস ব্যবহার করে না, সে সব জিনিস মালিকহীন সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। শিকার করা বা মাছ ধরার জন্য ধার-করা কোন ক্যানো বা অন্য কিছু নষ্ট হয়ে গেলে আদিম মানুষরা কখনোই নিজেদেরকে দায়ী বলে মনে করে না, আর কখনো তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবে না।

নিজের শরীরের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন কোন বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা আদিম মানুদের মধ্যে আসে না কেন? কারণ, রক্তের সম্বন্ধযুক্ত যে গোষ্ঠীটির মধ্যে সে বাস করে, সেই গোষ্ঠীর থেকে পৃথকভাবে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। আদিম মানুষের চারপাশে নিরন্তর বাস্তব বিপদ, আর অবিরাম নানান কাল্পনিক আতঙ্কের আস্তরণ। ফলে সে বিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। এমনকি বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচার ধারণাটুকুও জন্ম নেয় না তার মধ্যে। কোন আদিম মানুষকে তার গোষ্ঠী থেকে, দল থেকে বহিষ্কার করা আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোন ফারাকই নেই। যাবতীয় বর্বরজাতিদের মত মত প্রাগৈতিহাসিক গ্রীকরাও, গোষ্ঠীর কোন সদস্যকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বা ঘটনাচক্রে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে শাস্তি দিত বহিষ্কারের মাধ্যমে। নিজের মা-কে হত্যা করেছিল অরেস্তেস্। তারপর জনরোষকে শান্ত করার জন্য নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিল সে। যথেষ্ট অগ্রসর সভ্যতার ক্ষেত্রেও, যেমন ঐতিহাসিক যুগের গ্রীস ও ইতালীতে, নির্বাসন দণ্ডকেই চরম শাস্তি বলে মনে করা হত। গ্রীক কবি থিওগ্‌নিস্ বলেছেন,

"নির্বাসিতের থাকে না কোন বন্ধু, কোন বিশ্বস্ত সাথী, আর এই সঙ্গীহীনতাই নির্বাসনের চরম বেদনা"। আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে বাঁচতেই অভ্যস্ত ছিল। সঙ্গী-সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, একা একা দিন কাটানো তার কাছে এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার।

সভ্য মানুষদের তুলনায় আদিম মানুষরা ব্যক্তিগতভাবে পরিপূর্ণতর, কারণ তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের দল ও গোষ্ঠীর সাথে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে কি পরিবার, কি সম্পত্তি, কোন ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করা যায় না।[১]

গোষ্ঠীই ছিল সর্বেসর্বা, গোষ্ঠীই ছিল পরিবার। বিবাহও হত গোষ্ঠীর সাথে। আবার গোষ্ঠীই ছিল সব সম্পত্তির মালিক। গোষ্ঠীর মধ্যে সব জিনিসই সর্বসাধারণের। আফ্রিকার বুশ্‌ম্যান্‌রা কোন উপহার পেলে তা দলের সকল সদস্যকে ভাগ করে দেয়। কোন শিকার ধরলে বা যে কোন জিনিস পেলে সে তার অর্জিত দ্রব্য সাথীদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, দেখা যায় প্রায়শই তার নিজের ভাগে থাকে সবথেকে কম অংশ। দুর্ভিক্ষের সময় তরুণ ফুজিয়ানরা তল্লাশ চালায় উপকূল অঞ্চলে। হঠাৎ কোন জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীর (খুবই মুখরোচক খাদ্য) দেখতে পেলে তৎক্ষণাৎ সেটাকে তারা স্পর্শ না করে আগে ছোটে সঙ্গীদের খবরটা দিতে। খবর পেলেই অকুস্থলে ছুটে যায় সকলে। অতঃপর দলের প্রবীনতম সদস্যটি সকলের মধ্যে সেই শিকারলব্ধ জন্তুটিকে সমান ভাগে ভাগ করে দেন।

১। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিবার নেই, এমনকি মাতৃতান্ত্রিক পরিবারও না। শিশুরা গোটা গোষ্ঠীর সন্তান হিসাবে বিবেচিত হয়। নিজের মা ছাড়াও মায়ের বোনেদের এবং মায়ের বয়সী সমস্ত মহিলাকেই তারা মা বলে ডাকে। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথমে অবাধ, বাছবিচারহীণ সম্পর্ক চালু ছিল। সময়ের সাথে সাথে যৌনসম্পর্কের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। "জোড় বাঁধা পরিবার"-এর আগে চালু ছিল গোষ্ঠীর সকলের সাধারণ বিবাহ। একটি গোষ্ঠীর সকল নারীই অপর একটি গোষ্ঠীর সকল পুরুষের স্ত্রী, আর বিপরীতে, ঐ গোষ্ঠীর সকল পুরুষই ঐ নারীদের যৌথ স্বামী। দাম্পত্য সম্পর্ককে বৈধ করার জন্য একে অপরকে চেনা প্রয়োজন, আর একমাত্র এই কারনেই তারা মিলিত হত। সর্বশ্রী ফিসন্‌ এবং হাউইৎ সাম্যবাদী বিবাহের এই বিচিত্র রূপটি অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীতেও এই বিবাহের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

পশু ও মাছশিকার—উৎপাদনের অতি আদিম এই পদ্ধতি দুটি সবসময়ই যৌথভাবে করা হয় এবং লব্ধ শিকারকে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। মর্তিয়াস বলেছেন—ব্রাজিলের নির্ভীক উপজাতি বোতোকিউদস্-রা সকলে মিলে শিকার করে, আর যে জায়গায় শিকারটা পাওয়া যায় সেইখানেই বসে সকলে মিলে জন্তুটিকে উদরস্থ না করে সে জায়গা ত্যাগ করে না। ডাকোটা ও অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বন্ধেও একই তথ্য জানা যায়। যদিও কিছু কিছু জনগোষ্ঠীতে এই একত্রে শিকার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও সেইসব গোষ্ঠীতে শিকারলব্ধ পশুটিকে একত্রে খাওয়ার এই প্রাচীন পদ্ধতি এখনও চালু আছে। সফল শিকারী তার শিকারলব্ধ প্রাণীটিকে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করে, এবং তাতে সে তার গোষ্ঠীর, গ্রামের, এবং কখনও কখনও গণের সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ জানায়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা একটি জাতীয় ভোজসভায় রূপান্তরিত হয়। ককেশাসের স্ভারিতি অঞ্চলে যখনই কোন পরিবার কোন ষাঁড়, গোরু বা ডজনখানেক ভেড়া কাটে, তখনই সারা গ্রামের একটা ভোজসভা বসে যায়। বিগত বছরগুলিতে যারা মারা গেছে, তাদের কথা স্মরণ করে গ্রামবাসীরা একসঙ্গে বসে ভোজ খায়, পান করে। এই সার্বজনীন ভোজসভাতে স্মৃতিচারণা করা হয় মৃত পূর্বপুরুষদের ভোজসভার।

আদিম সাম্যবাদী রীতিনীতি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছেন মর্গান। নিজের শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ রচনায়[১] তিনি উত্তর আমেরিকার রেড্‌স্কিন্‌দের শিকার করা ও মাছ ধরার পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন: "সমতল-ভূমির গোষ্ঠীগুলি প্রায় পুরোপুরিভাবে জান্তব খাদ্যের (animal food) ওপর নির্ভরশীল। তাদের শিকারের ধরণের মধ্যেও সাম্যবাদের দিকে সেই একই ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বাইসন শিকারের সময় ব্ল্যাক্‌ফিট্-রা (Blackfeet) পশুর দলটাকে তাড়া করে ঘোড়ায় চেপে। বড় বড় অশ্বারোহী দল থাকে। প্রতিটা দলেই থাকে পুরুষ, নারী ও শিশুরা।

পশুদের দলটাকে তাড়া করা শুরু হওয়ার পর শিকারীরা মৃত পশুটিকে শিকারের রাস্তাতেই ফেলে রেখে যায়। তাদের পিছনে প্রথমে যে আসবে, সেই-ই পাবে ঐ পশুটিকে। সকলে শিকার না পাওয়া পর্যন্ত বণ্টনের এই পদ্ধতি চলতেই থাকে। শিকারের মাংসটাকে খণ্ডখণ্ড করে কাটা হয়। তারপর

১। লুই হেন্‌রী, মর্গান, "হাউসেস অ্যাণ্ড হাউস লাইফ অফ দ্য অ্যামেরিকান অ্যাবরিজিন্‌স্"। ওয়াশিংটন, ১৮৮১.

হয় সেটাকে খোলা হাওয়ায় শুকিয়ে বা আগুনে ঝলসিয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ কিছুটা মাংস দিয়ে পেমিক্যান্ (pemmican) বানায়। পেমিক্যান্, অর্থাৎ শুকনো ও গুঁড়ো মাংসর সঙ্গে বাইসনের গলানো চর্বি মিশিয়ে পশুচর্মের ওপরে রেখে সিদ্ধ করা খাদ্য। পৃথিবীর যে কোন নদীর থেকে কলম্বিয়া নদীতে অনেক বেশি মাছ পাওয়া যায়। এই কলম্বিয়া নদীতে মাছ ধরার মরশুমে গোষ্ঠীর সকল সদস্য একসঙ্গে থাকে এবং সংগৃহীত মাছের একটা সার্বজনীন ভাণ্ডার গড়ে তোলে। দলে নারীদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিদিন সেটাকে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকেই সমান ভাগ পায়। মাছগুলিকে ফালি ফালি করে কেটে চিরে দিয়ে মাচায় রেখে শুকোনো হয়, তারপর ঝুড়িতে ভরে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়"।

আদিম মানুষ যখন যাযাবর জীবন ত্যাগ করে কোন জায়গায় স্থিতু হয়ে বাসস্থান বানাত, তখন কিন্তু সেই বাসস্থান ব্যক্তিগত না হয়ে সার্বজনীন বাসস্থান হিসাবেই গণ্য ও ব্যবহৃত হতো। এমনকি পরিবারগুলি যখন মাতৃ-তান্ত্রিকরূপ নিতে শুরু করে তার পরেও এই বাসস্থানগুলিকে সার্বজনীন ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে।

লা পেরুজ্ পলিনেশিয়ায় যে ধরণের গোষ্ঠীগত বাসস্থান আবিষ্কার করেছিলেন, এই বাসস্থানগুলিও সে-রকমই,—উচ্চতায় ১০ ফুট, দৈর্ঘ্যে ১১০ ফুট এবং প্রস্থে ১০ ফুট। দুই প্রান্তে দু'খানি দরজা। এই বাসস্থানে ১০০ জনেরও বেশি লোকবিশিষ্ট কোন গোষ্ঠী বাস করতে পারে। মর্গান বলেছেন, ইরোকোয়ান্সের দীর্ঘ বাসস্থানগুলি বর্তমান শতাব্দীর সূচনার আগে থেকেই আর দেখা যায় না। এই বাসস্থানগুলি ছিল ১০০ ফুট লম্বা, ৩০ ফুট চওড়া এবং ২০ ফুট উঁচু ; এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা লম্বা দালান মত থাকত, আর তার দু'দিকে থাকত দুটি প্রবেশ-পথ। এই দালানের মধ্যে মৌচাকের কুঠরিগুলির মত এক সারি ছোট ছোট ৭ ফুট করে চওড়া ঘর থাকত। এই সব ঘরে বাস করত গোষ্ঠীর বিবাহিতা নারীরা। প্রত্যেকটি বাসস্থান গোষ্ঠীর নিজস্ব টোটেম্-এর চিহ্নযুক্ত। টোটেম, অর্থাৎ যে পশুটিকে গোষ্ঠীর আদি পুরুষ বলে মনে করা হত। বোর্নিও-র ডিয়াক্দের বাসস্থানগুলিও একইরকম। তফাৎ শুধু একটাই— শক্ত কাঠের খুঁটির ওপরে এই বাসাগুলি মাটি থেকে ১৫-২০ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকে। এগুলি দেখলে সুইস্ হ্রদে আবিষ্কৃত হ্রদস্থ শহরের কথা মনে পড়ে যায়। হ্রদের মধ্যে বাড়িগুলি তৈরী হত শক্ত দণ্ডের ওপর। হেরোডোটাস বলেছেন যে পায়োনিয়ানরা লেক প্রেসিয়াম্-এ এই ধরনের বাড়িতেই বসবাস করত

(V, বিভাগ ১৬)। মেক্সিকোর রেড্‌স্কিনদের casus grandes-এ একটা বিশাল সিঁড়ি দেখা যায়, তাতে একের পর এক তল, প্রতিটি তলে বিবাহিতদের জন্য ছোট ছোট কামরা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীকরা সম্ভবত এই ধরনের সাম্যবাদী বাসস্থানেই থাকত। ডক্টর শ্লিমান-এর খননকার্যের ফলে আর্গোলিস্‌-এ যে প্রাসাদটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেও এই সিদ্ধান্তেই আসা যায়। এইসব সাম্যবাদী বাসস্থানে সমস্ত জিনিসপত্র সকলের এবং খাদ্যও সার্বজনীন।

এই সব গোষ্ঠীগত বাসস্থানের অধিবাসীদের জীবনের বিবরণ মর্গানের লেখাতেই পাওয়া যায়। এটা সত্য যে তাঁর গবেষণা মূলত ছিল আমেরিকার রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের উপর, প্রধানত ইরোকোয়াদের নিয়ে, এবং তাদের মধ্যেই তিনি বহুকাল বসবাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "ইরোকোয়াদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বা ইতিবাচক রীতির সন্ধান পেলে বোঝা যায় যে একই অবস্থায় থাকা অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও ঐ রীতিটির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, কারণ তাদের প্রয়োজন তো একই"।

"ইরোকোয়ারা গৃহস্থালি গড়ে তুলত, বাগান করত, শস্য তুলে সেটাকে সার্বজনীন সঞ্চয় হিসাবে মজুত করত বাসস্থানে। এই সব ফসলের ওপর কমবেশি ব্যক্তিগত মালিকানা থাকত, থাকত ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নিজস্ব অধিকার। যেমন, খোসা ছাড়ানোর পর শস্যকে খড় দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ করে বেঁধে ভিন্ন ভিন্ন কামরায় ঝুলিয়ে রাখা হত। কিন্তু কোন পরিবারের শস্য ফুরিয়ে গেলে অন্য পরিবারগুলি তাদেরকে শস্য দিত—যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে শস্য জমা থাকত। শিকার বা মাছ ধরার প্রতিটি দলই তাদের সংগৃহীত বস্তুর এক সার্বজনীন মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলত। উদ্বৃত্ত অংশটা ভাগ করে দেওয়া হত প্রতিটি গৃহস্থালির বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে। সেগুলোকে শুকনো করে তুলে রাখা হত শীতকালের জন্য"। এইসব ইণ্ডিয়ান গ্রামগুলিতে আমরা সার্বজনীন রীতিনীতির পাশাপাশি সংযুক্ত ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটাও দেখতে পাই। "নির্দিষ্ট মালিক ছাড়া কোন ইণ্ডিয়ান বাড়ি ও পরিবারে কোন জিনিস নেই", দেলাওয়ার এবং মান্‌সী-দের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হেক্‌ওয়েল্ডার লিখেছেন; "প্রত্যেকেই জানে কোন্ ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল বা বিড়াল-ছানা, মুরগিছানাটা তার নিজের।... প্রায়শই একপাল বিড়াল ছানা বা মুরগিছানার কয়েকজন মালিক থাকে। প্রায় যতগুলি প্রাণী, ততজন দাবীদার। ছানা-পোনা সমেত একটা মুরগি কেনার জন্য অনেক সময়ই বেশ কয়েকজন শিশুর সঙ্গে দর-দাম করতে হয়। এইভাবে,

জনগোষ্ঠীদের মধ্যে একদিকে যেমন গোষ্ঠীগত সম্পত্তির নিয়ম কানুনের অস্তিত্ব বর্তমান আবার অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও স্বীকৃত।"[১]

লাগুনা গ্রামের (নিউ মেক্সিকো) রেড ইণ্ডিয়ানদের সার্বজনীন ভাণ্ডার থাকত। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গর্ম্যান ১৮৬৯ সালে মর্গানকে লিখছেন—"এদের নারীরাই সাধারণত তাদের শস্যভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করে, আর তাদের স্প্যানিশ প্রতিবেশীদের তুলনায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অনেক বেশি দূরদর্শী। তারা এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত রাখার চেষ্টা করে। পর পর দু'বছর অজন্মা হলে তবেই গোষ্ঠীগত ভাবে পুয়েব্লারা অনাহারে থাকে"।

মায়া ইণ্ডিয়ানদের গ্রামের সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত হয় একটা কুটিরে। প্রতিটি পরিবার তার অংশের খাদ্য উপকরণ সেখানে পাঠায়। নারী আর শিশুদের একটা আশ্চর্য মিছিল দেখেছিলেন ষ্টিফেন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির পাত্র, তাতে কিছুটা করে ধূমায়িত উষ্ণ খাদ্যবস্তু। একই রাস্তা দিয়ে এসে ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ছিল তারা।[২]

কিন্তু ইরোকোয়াদের মধ্যে প্রতিটি সম্মিলিতপরিবারই তার সদস্যদের খাদ্য প্রস্তুত করত। প্রতিটি পরিবারকে তার প্রয়োজন মত খাদ্য ভাগ করে দিত গৃহকর্ত্রী। মাটির অথবা কাঠের পাত্রে প্রত্যেককে উষ্ণ খাদ্য পরিবেশন করা হত। আজকালকার দিনের মত কোন টেবিল, চেয়ার বা থালা ছিল না, ছিল না কোন রান্না বা খাবারঘর ধরনের কোন জায়গা। সবথেকে সুবিধেজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে প্রথমে খেতো পুরুষরা, তারপর নারী আর শিশুরা। অবশিষ্ট খাদ্যটুকু রেখে দেওয়া হত, পরিবারে যখন যার খিদে পেতো, সে তখন সেটা খেতো। সন্ধ্যে নাগাদ মেয়েরা 'হোমিনি' রান্না করত। ভুট্টাকে চালের খুদের মত করে ভেঙে সিদ্ধ করে সেটা তৈরী হত। সেটাকে ঠাণ্ডা করে সকালে খাওয়ার জন্য এবং সন্ধ্যায় অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য রেখে দেওয়া হত। বাঁধাধরা প্রাতরাশ বা নৈশাহার বলে তাদের কিছু ছিল না।

১। হেক্‌ওয়েল্ডার।—"একদা পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে বসবাসকারী ইণ্ডিয়ান জাতিগুলির ইতিহাস, আচার-আচরণ ও প্রথা"। ১৮৭৬ সালে পুনর্মুদ্রিত। (১৭৭১ থেকে ১৭৮৬, এই পনেরো বছর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মিশনারী হিসাবে বসবাস করেছিলেন হেক্‌-ওয়েল্ডার। তাদের ভাষাও উত্তমরূপে জানতেন তিনি)।

২। স্টিফেন্‌। "ইয়ুকাতান্‌-এ ভ্রমণের ঘটনাবলী", ২য় খণ্ড।

খিদে পেলে ঘরে যা থাকত, তা-ই খেয়ে নিত। তারা ছিল মিতাহারী। মর্গান বলেছেন—'আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের জীবন যখন আবিষ্কৃত হল, তখন এটাই হলো সাধারণভাবে তাদের জীবনের স্পষ্ট চিত্র'।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীসেও এই একই রীতি চোখে পড়ে। আর ঐতিহাসিক যুগের 'সিসিতিস্' (সার্বজনীন ভোজ) সেই আদিম সাম্যবাদী ভোজের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। পণ্টাসের হেরাক্লিড্স্ যিনি প্লেটোর শিষ্য আমাদের জন্য ক্রেটার সাম্যবাদী ভোজের বিবরণ রেখে গিয়েছেন। এই আদিম পদ্ধতি সেখানে সুদীর্ঘকাল চালু ছিল। আঁদ্রেইস্-এ (পুরুষদের ভোজ) প্রাচীন ব্যক্তিদের পরিষদের সদস্য (geronia) আর্কনরা ছাড়া প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিক খাদ্যের সমান ভাগ পেতো। প্রাচীন ব্যক্তিদের পরিষদের (জেরোনিয়া) সদস্যরা পেতো অন্যদের থেকে চারগুণ বেশিখাদ্য। একভাগ সাধারণ নাগরিক হিসাবে, একভাগ ভোজসভার সভাপতি হিসাবে, আর দুটি অতিরিক্ত ভাগ হল শিশু এবং আসবাবপত্র দেখাশোনা করার জন্য। ভোজের সমস্ত টেবিলের তত্ত্বাবধান করতেন একজন কর্ত্রী। তিনি ভাগ করতেন খাদ্য। সকলের সামনেই সবথেকে চমৎকার খাদ্যটা তিনি সরিয়ে রাখতেন পরিষদে বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব যারা দেখিয়েছে তাদের জন্য। প্রথমে পরিবেশন করা হত অতিথিদের, এমনকি আর্কনদেরও আগে। অতিথিদের হাতে হাতে ঘুরতো মদের ভাণ্ড আর জলপাত্র। ভোজ শেষ হলে আবারপূর্ণ করা হত পাত্রটাকে। হেরাক্লিড্স শুধুমাত্র পুরুষদের সার্বজনীন ভোজের কথাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হোয়েক্ (Hoeck)-এর ধারণা ডোরিয়ান নগরে নারী ও শিশুদেরও সার্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা ছিল। আদিম ও বর্বরদের মধ্যে দুটি বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতা সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জানা আছে, তা থেকে মনে হয় ক্রেটার এই পণ্ডিত ঐতিহাসিক সঠিক ধারণাই করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন—গোষ্ঠীর উৎপন্ন ফসল, গরু ও ভেড়ার পাল আর ভূমিদাসদের প্রদত্ত কর থেকেই এইসব ভোজসভার ব্যবস্থা করা হত। এর থেকে বোঝা যায় যে ক্রেটার পুরুষ, নারী ও শিশুদের ব্যয়ভার বহন করত রাষ্ট্র। অ্যারিস্টটল জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ভোজসভা সম্ভবত বহু প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। ওনোট্রিয়ানদের মধ্যে ক্রেটা এবং ইটালাসে এই ভোজসভার সূত্রপাত করেন মিনোস। ঐ সব জায়গার অধিবাসীদের কৃষি-কাজও শিখিয়েছিলেন তিনি। অ্যারিস্টটল দেখেছিলেন ঐ সার্বজনীন ভোজ ইতালিতে তখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। আর এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এই প্রথার জন্ম ইতালিতেই, কিন্তু সমস্ত আদিম জনগোষ্ঠীতেই যে এই প্রথা চালু

আছে—এ তথ্যটাকে তিনি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করেন নি।[১]

প্লুটার্ক বলেছেন, এই সার্বজনীন ভোজসভায় সকলকেই সমান চোখে দেখা হত। তাই তিনি এগুলিকে অভিজাতদের জমায়েত (Sunedria aristokratika) বলে নির্দেশ করেছেন। একই টেবিলে যারা বসত, সম্ভবত তারা একই পরিবারের সদস্য। স্পার্টায় একটা ভোজসভার সদস্যদের একটা সৈন্য বাহিনী গড়া হত এবং তারা লড়াই একসঙ্গে করত। আদিম ও বর্বররা সব সময়েই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। যুদ্ধের সময়ও তারা নিজেদেরকে বিন্যস্ত করত পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতি অনুযায়ী।

গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যই খাদ্য থেকে তার অংশ পাবে, এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে গ্রীক ভাষায় মইরা (moira) শব্দটি বলতে বোঝায় কোন ভোজসভায় একজন অতিথির প্রাপ্য ভাগ। পরে এই শব্দটিরই অর্থ দাঁড়িয়েছিল 'নিয়তি' (Destiny), মানুষ ও দেবতা, সকলেই যে সর্বোচ্চ দেবীর অধীন। ক্রেটার ভোজসভায় কোন কর্ত্রী যেমন প্রত্যেক অতিথিকে তার প্রাপ্য ভাগ পরিবেশন করত, সেইভাবে এই নিয়তি প্রত্যেককে তার জীবনের প্রাপ্য অংশটুকু বণ্টন করে দেয়। উল্লেখ করা যায় যে গ্রীক পুরাণে নিয়তি এসেছে নারী রূপে—ময়রা (Moira), আইসা (Aissa) ও কেরেস্ (Keres) নামে। খাদ্য বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারায় প্রতিটি ব্যক্তি যে অংশটুকু পেতো, সেই অংশটিকেই চিহ্নিত করা হত নিয়তির ঐ নামগুলি দিয়ে।

একসময় সমগ্র গোষ্ঠীর একটাই সাধারণ বাসস্থান ছিল। ক্রমশঃ সেগুলি ভাগ ভাগ হয়ে গড়ে উঠল ব্যক্তিগত আবাস। এইসব আবাসে থাকত একটি করে পরিবার। এই সময়ই বন্ধ হয়ে গেল সার্বজনীন ভোজ। শুধু গ্রীক সিসিতিস্-এর মত কোন ধর্মীয় বা জাতীয় অনুষ্ঠানে ভোজ হত অতীতের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই। জিনিসপত্র প্রত্যেক পরিবারের নিজের অধিকারে থাকলেও বস্তুত সেগুলি গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতেই থাকত। ক্যাটলিন বলেছেন, "ইণ্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর যে কোন পুরুষ, নারী বা শিশু যে কোন লোকের ঘরে প্রবেশ করতে পারে, এমনকি গোষ্ঠী-প্রধানের ঘরেও, এবং খিদে পেলে সেখান থেকে সে খেতেও পারত। দেশের দরিদ্রতম ও চূড়ান্ত অপদার্থ মানুষটিরও এই অধিকার ছিল। নিজের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বা নিজের

১। অ্যারিসটটল্, 'পলিটিক্স'—২য় সম্ভার, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অংশ। ৪র্থ সম্ভার ১ম পরিচ্ছেদ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ অংশ। ফরাসী সংস্করণ, হিলোয়ার ১৮৪৮।

শিকারের ব্যাপারে যদি সে একেবারে অলস হয়, তাহলে যে কোন বাড়িতে ঢুকে যেত। যতক্ষণ খাদ্য থাকবে, ততক্ষণ সকলেই তাকে খাদ্যের ভাগ দেবে। অবশ্য যারা এইভাবে ভিক্ষা করত, পরে যখন তারা শিকার করতে সমর্থ হতো সংগৃহীত মাংসের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হত। কারণ তাকে কাপুরুষ বা ভিক্ষুকের লজ্জাকর ছাপ আগেই দেগে দেওয়া হয়েছে।"

ক্যারোলিন দ্বীপের কোন বাসিন্দা কোথাও যাওয়ার সময় সঙ্গে কোন খাবার বা পানীয় নেয় না। খিদে পেলে কোন রকম ভদ্রতার ধার না ধেরেই সে কোন একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর কারুর কোন অনুমতির তোয়াক্কা না করেই পোপোই-এর (গম দিয়ে তৈরী আঠালো খাদ্য) পাত্র নিয়ে বসে পড়ে। খিদে মিটে গেলে কাউকে ধন্যবাদ না জানিয়েই বিদায় নেয়। যেন এটা তার অধিকার।

এইসব গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্যবাদী জীবনধারা এক সময় সাধারণ চিত্র ছিল। স্পার্টার অধিবাসীদের মধ্যে বর্বর জীবন থেকে পার হয়ে আসার বহুদিন পরেও ল্যাসিডিমোনিয়ায় এই সব প্রথা চালু ছিল। কারুর নিজের অধিকারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কোন বস্তু থাকাটা ছিল একেবারেই অনিশ্চিত ও অপ্রয়োজনীয়। পৌরানিক চরিত্র লাইকারগাস্-এর নামেই স্পার্টানরা তাদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করত। প্লুটার্ক বলেছেন এই লাইকারগাসই বাড়ির দরজা বন্ধ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, যাতে করে যে কেউ ইচ্ছে করলে যে কোন বাড়িতে ঢুকতে পারে, নিজে নিজেই দরকার মত খাবার ও বাসন পত্র নিতে পারে, এমনকি বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতেও স্পার্টার প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ছিল কোন রকম অনুমতিছাড়াই অন্য যে কোন স্পার্টানবাসীর ঘোড়ায় চড়ার, তার কুকুরদের ব্যবহার করার, এমনকি তার দাসদেরও মুক্তি দেওয়ার।

এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের মনে খুব ধীরে ধীরে এসেছিল। ফিলিস্তাইনদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একান্তই স্বাভাবিক, তাদের মনে এর ধারণাও বদ্ধমূল। একেবারে প্রথম যুগের মানুষের চিন্তাভাবনা বরং তাকে ভাবতে শিখিয়েছিল যে সব জিনিস সকলেরই হওয়া উচিৎ। হেকওয়েল্ডার লিখেছেন, "ইণ্ডিয়ানরা মনে করত এক পরম শক্তি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতে যা কিছু বর্ত্তমান আছে তা, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির কল্যানের জন্যই। দেশে দেশে তিনি প্রচুর শিকার দিয়েছেন সকলের জন্য, মাত্র কয়েকজনের মঙ্গলের জন্য নয়। সব কিছুই মানব-সন্তানদের জন্য। পৃথিবীতে যা কিছু বাস করে, মাটিতে যা কিছু ফলে, নদীতে ও জলে যা কিছু

পাওয়া যায়—সবই যৌথ সম্পদ, প্রত্যেকেই তা থেকে নিজের অংশ পাওয়ার অধিকারী। তাদের কাছে আতিথেয়তা কোন বিশেষ গুণ নয়, এক কঠোর কর্তব্য·· তারা অনাহারে থাকবে, তা-ও ভাল। কিন্তু কখনোই এমন কিছু করবে না যাতে বলা যায় তারা কর্তব্যে অবহেলা করেছে, অতিথি, অসুস্থ মানুষ, বা অভাবীর চাহিদা মেটায়নি···কারণ যৌথ ভাণ্ডার ব্যবহার করার অধিকার ত সার্বজনীন। কোন শিকারী জঙ্গল থেকে যা শিকার করে আনে, সেই সংগৃহীত মাংস তার একার নয়, সকলের। আর শস্য ও তরি-তরকারি তো সার্বজনীন জমিতেই ফলে, তা-ও আবার মানুষের ক্ষমতায় নয়, পরম শক্তির ক্ষমতায়"।[১]

যে জার্মানরা বেলজিয়াম ও গল আক্রমণ করেছিল, তাদের মধ্যে একই ধরণের সাম্যবাদ লক্ষ্য করেছিলেন সিজার। তিনি বলেছেন যে তাদের প্রথার অন্যতম লক্ষ্য হল, "মানুষের মধ্যে সমতার বোধ জাগিয়ে তোলা, কেননা প্রতিটি মানুষই দেখতে পায় যে সবথেকে শক্তিমান মানুষটির সঙ্গে তার নিজের সংস্থানের কোন পার্থক্যই নেই, তারা দু'জনেই সমান"। আর কার্যতঃ, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ আসার জন্য পূর্বশর্ত হল গোষ্ঠী ও উপ-জাতির সকল সদস্যের মধ্যে এক যথার্থ সমতা কারণ যারা তারা নিজেদের একই প্রজাতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাম্যবাদ শুধু সমতাই বজায় রাখত না, ভ্রাতৃত্ব ও উদারতার মনোভাবকেও বিকশিত করত। এই ভ্রাতৃত্ব ও উদারতা খ্রিশ্চিয়ানদের বহুল কথিত ভ্রাতৃত্ব বোধ ও বদান্যতার থেকে অনেক মহৎ। বাইবেল আর ব্র্যাণ্ডি, সভ্যতার বর্বর বনিকবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, তাদেরকে অধঃপতিত করার আগে যাঁরা এই সব আদিম জনগোষ্ঠীগুলিকে দেখেছিলেন, ঐ ভ্রাতৃত্ব আর উদারতা তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

মানুষের বিকাশের পরবর্তী কোন পর্যায়েই এত সরল ও যথার্থ আতিথেয়তা

---

১ আধুনিক কালের অন্যতম মহান চিন্তাবিদ হব্‌স্‌-ও এ-ব্যাপারে। অন্য কিছু ভাবেননি।

"সমস্ত কিছুর ওপর আমাদের প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়েছে প্রকৃতি," 'De Cive, গ্রন্থে হব্‌স্‌ লিখেছেন,—"প্রকৃতির জগতে প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছেমত কাজকরার ও ইচ্ছেমত যে কোন জিনিস নেওয়ার অধিকার আছে ঃ তাই বলা হয় যে প্রকৃতি সকল মানুষকে সকল জিনিস দিয়েছে, আর এ থেকেই বোঝা যায় প্রকৃতির জগতে উপযোগিতাই হচ্ছে অধিকারের নিয়ম।"

খুঁজে পাওয়া যায় না। মর্গান বলেছেন, "দিনের যে কোন সময়ে কোন গ্রামবাসী, গোষ্ঠীর কোন মানুষ বা কোন আগন্তুক কোন ইরোকোয়ার বাড়িতে ঢুকলে তাকে খেতে দেওয়া সেই বাড়ির স্ত্রীলোকদের কর্তব্য। এ কাজে ত্রুটির অর্থ খোলাখুলি অপমান করার মতই এক অভদ্রতা। ক্ষুধার্ত থাকলে সে খাবে, আর তা না হলে সৌজন্যের খাতিরে খাদ্যটা একটু চেখে দাতাকে ধন্যবাদ জানাবে"।

"উদার, না হওয়া বিশেষত অভাবীদের প্রতি বা নিজের পরিবারের কারুর সঙ্গে অনুদার ব্যবহার করাকে বিরাট অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত এবং তার জন্য গোষ্ঠীর অন্যান্যরাও বদনামের ভাগী হত"—বলেছেন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের আদিম রীতিনীতির আরেকজন ছাত্র।[১] অতিথি সর্বদাই পবিত্র, এমনকি সে শত্রু হলেও। যে বর্বর জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল, তাদের মধ্যেও এই একই প্রথার বিবরণ দিয়েছেন ট্যাসিটাস। তিনি লিখেছেন, "আর কোন এমন জনগোষ্ঠী নেই যারা সামাজিক আমোদ প্রমোদে এত বেশি আসক্ত বা আতিথেয়তার ব্যাপারে এত বেশি উদার। নিজেদের বাড়িতে যে কোন লোককেই প্রবেশাধিকার না দেওয়া গুরুতর অপরাধ। প্রত্যেকেই তার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আহার দেয় অতিথিকে। নিজের ঘরের খাদ্যসামগ্রী ফুরিয়ে গেলে গৃহস্বামী অতিথিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় আরেকটি অতিথিবৎসল আশ্রয়ে। পরের যে বাড়িটিতে প্রবেশ করে তারা সেখানে ও একইরকম আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাদের। অপরিচিত আগন্তুক এবং পরিচিত বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতিথেয়তার ব্যাপারে কোন রকম পার্থক্য করা হয় না।"

নিজের সুসভ্য দেশবাসীদের কাছে এই বর্বর জার্মানদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছিলেন ট্যাসিটাস। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৯ পর্যন্ত আট বছর উত্তর আমেরিকার বর্বরতম ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বসবাস করেছিলেন ক্যাটলিন। তিনি লিখেছেন, "আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি, ওদেরকে নৈতিকতা ও সদ্গুণ শেখানোর দায় সভ্য দুনিয়াকে নিতে হবে না।"

মিস্টার স্ট্যানলীর মত যে সব পর্যটকরা বিপজ্জনক ও লোভী বাণিজ্যিক পর্যটক ছিলেন না, তাঁরা আদিম মানুষদের গুণাবলী সম্বন্ধে সিজারের মত একই

১ জেম্‌স্‌ অ্যাডেয়ার। "হিস্ট্রী অফ দ্য আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্‌স্‌", লণ্ডন, ১৭৭৫.

সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন এইসব গুণগুলোর উৎস তাদের ঐ সাম্যবাদ। জেসুইট্ শার্লভয় বলেছেন, "রেড্‌স্কিনদের ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এর একটা কারণ হল আমার আর তোমার, 'এই শীতল শব্দগুলি' —সেণ্ট জন ক্রীস্‌স্টোমস্ এইভাবেই বলতেন, আদিম মানুষদের কাছে এখনও একেবারেই অপরিচিত। অনাথ বিধবা এবং রুগ্নদেরকে ও তারা আন্তরিক ভাবে রক্ষা করত, কারণ অত্যন্ত সম্মানজনক এক আতিথেয়তায় তারা অভ্যস্ত ছিল। এ সবই তাদের এক দৃঢ় প্রত্যয়ের ফল। তাই তারা বিশ্বাস করে—"সব জিনিস সব মানুষের সাধারণ সম্পদ হওয়া উচিৎ"।[১] সমকালীন সমালোচক যুক্তিবাদী লাহোন্তান্ কী বলেছেন শোনা যাক,— "আমার আর তোমার মধ্যে পার্থক্য করে না আদিম মানুষেরা, কারণ তাদের মধ্যে একজনের জিনিস মানেই অন্যজনের জিনিস। আমাদের শহরগুলির উপকণ্ঠে যে সব খ্রিশ্চিয়ান আদিম মানুষরা থাকে, তাদের মধ্যেই শুধু টাকা-কড়ির ব্যবহার চালু আছে। এছাড়া অন্যরা টাকা-কড়ি নিয়ে কাজ তো করবেই না, এমনকি সেদিকে চেয়ে পর্যন্ত দেখবে না। ওদের ভাষায় টাকা বস্তুটা হচ্ছে 'শ্বেতাঙ্গ মানুষদের সাপ'। কয়েকজন অন্যদের থেকে বেশি ভোগদখল করবে এবং তাকে বেশী মর্যাদাও দেওয়া হবে—এই ব্যাপারটাই ওদের অদ্ভুত বলে মনে হয়। তারা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি করে না, চুরি করে না, বা কেউ কাউকে খারাপ কথা বলে না।"[২]

বর্বর মানুষদের বড় বড় দলগুলি গঠিত হয় ৩০ বা ৪০ জন সদস্য নিয়ে। যতক্ষণ তারা যাযাবর থাকে, ততক্ষণ তারা এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে বেঁচে থাকার উপকরণ পাওয়া যায় সেখানেই থেকে যায়। সমুদ্র উপকূল আর নদী পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলি থেকেই তারা খাদ্য সংগ্রহ করে। সম্ভবত নদী পথে যেতে যেতেই বর্বররা মহাদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটাই মর্গানের অভিমত। এখনও এই বর্বর অবস্থাতেই আছে বুশ্‌ম্যান আর সিংহলের ভেদ্দারা। স্থাবর সম্পত্তির আদিমতম রূপ হিসাবে ধরা হয় শিকারের এলাকাগুলিকে, সেইসব এলাকাগুলিতেও সম্পত্তির অধিকার প্রমাণ করার কথা

১। শার্লভয়, "Historio de la Nouvelle France"

২। "Voyage de Lahontan", II.

তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

যে আদিম মানুষ চাষ করে না, শিকার ও মাছধরাই যার সম্বল, বুনো ফল আর দুধ খেয়ে যে বেঁচে থাকে—নিজের এবং নিজের পশুদলের ভরণপোষণের জন্য তাকে অবশ্যই এক বিশাল অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে হবে। হিসাব করলে দেখা যেত—জানি না এ হিসাব কতটা নির্ভুল—যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি বর্বর মানুষের তিন বর্গমাইল জমি প্রয়োজন হয়। তাই কোন দেশে যখন লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দেশের জমি ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

জমির প্রথম ভাগাভাগি হয়েছিল পশুচারণের এলাকা ও শিকারের এলাকা—এইভাবে। এই এলাকাগুলিতে গোষ্ঠীর সকলেরই অধিকার থাকত। কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারনা আরও পরবর্তীকালে, আরও বিলম্বিত লয়ে এসেছে। "মাটি হচ্ছে আগুন আর জলের মত, তা বিক্রি করা যায় না"—ওমাহাস্ বলেছেন। জমি বিক্রি করা যায়—এ-কথা মাওরিরা ভাবতেই পারে না। "ধরা যাক কখনো সমগ্র গোষ্ঠীই জমি বিক্রির ব্যাপারে একমত হল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন নতুন শিশুর জন্ম হলেই, ঐ জমির ওপর তারা একটা অতিরিক্ত মূল্য দাবী করবে। তাদের যুক্তি থাকবে—নিজেদের অধিকারটা না হয় বিক্রি করেছি, কিন্তু যারা এখনও জন্মায়নি, তাদের অধিকারটা তো আর বিক্রি করিনি। নিউজিল্যাণ্ড সরকারের সামনে এ সমস্যা মেটানোর একটাই পথ : কোন উপজাতির জন্য অনুদান হিসাবে জমি কিনে দেওয়া যাতে প্রতিটি জাত,শিশুরই অংশ থাকবে।" ইহুদি এবং সেমিটিক্‌দের মধ্যে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। "জমি চিরদিনের জন্য বিক্রি করে দেওয়া যাবে না, কারণ জমিটা আমার; তোমরা অতিথি আমার সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করছো মাত্র"। (Leviticus XXV ২৩)। খ্রীশ্চিয়ানরা তাদের ঈশ্বরের এই নির্দেশকে যদিও অবজ্ঞা করে থাকে। জিহোভা এবং তাঁর নির্দেশাবলীকে খুবই শ্রদ্ধা করে তারা, কিন্তু মহান ক্ষমতাবান পুঁজির প্রতি তারা পোষণ করে আরও বেশি পরিমাণ শ্রদ্ধা।

ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উন্মেষ হওয়ার আগে মানবসমাজকে বিকাশের এক ও দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। ফুজিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় গোষ্ঠীর শিকারের অঞ্চলের চারদিক ঘিরে সুবিস্তীর্ণ অনধিকৃত ভূখণ্ড ছড়িয়ে আছে। সিজার এর বক্তব্যেও দেখা যায় যে সুভি ও জার্মানরা নিজেদের দেশের সীমানার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ

জনশূন্য অঞ্চলের জন্য গর্ব করত (De Bello Gallico, iv, ৩)। আদিম ও বর্বর মানুষরা তাদের সীমানার চারদিকে নিরপেক্ষ অঞ্চল রাখত। কারণ কোন গোষ্ঠীর এলাকার মধ্যে কোন বহিরাগতকে পাওয়া গেলে বন্য পশুর মত তাড়া করা হত তাকে, আর ধরা পড়লে অঙ্গচ্ছেদ অথবা হত্যা করা হত। হেক্‌ওয়েল্ডার বলেছেন—নিজেদের এলাকায় কোন বহিরাগতকে পেলে তার নাক-কান কেটে দেয় রেড্‌স্কিনরা, আর তাকে ছেড়ে দেওয়ার সময় বলে দেয়—তোমাদের মোড়লকে গিয়ে বোলো, পরেরবার তোমাদের মাথার ছাল খুলে নেবো। একটা সামন্ততান্ত্রিক প্রবচন আছে—যেখানেই জমি, সেখানেই যুদ্ধ। প্রাচীনকালে কথাটা খুবই সত্য ছিল। প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান কারণের অন্যতম ছিল শিকারের এলাকা লঙ্ঘন। অন্যের এলাকায় প্রবেশ ঠেকানোর জন্য পরবর্তীকালে অনধিকৃত এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঐ সব জায়গায় বাজার বসত, বিভিন্ন গোষ্ঠী সেখানে তাদের জিনিস-পত্র বিনিময় করত। ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারল্ড পরাজিত করেন ক্যাম্ব্রিয়ানদের। এই ক্যাম্ব্রিয়ানরা চিরকাল অনধিকার প্রবেশ করত স্যাক্সনদের এলাকায়। ক্যাম্ব্রিয়ানদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেন হ্যারল্ড—ওফার পরিখার পূর্বদিকে কোন ক্যাম্ব্রিয়ানকে সশস্ত্র অবস্থায় পাওয়া গেলে তার ডান হাতটা কেটে দেওয়া হবে। স্যাক্সনরাও নিজেদের এলাকায় পরিখা খনন করে। দু'দিকের সীমানায় দেয়াল তোলা হয়। আর দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী অঞ্চলটা হয়ে ওঠে নিরপেক্ষ ভূখণ্ড। উভয় জাতির বণিকরাই সেখানে বাণিজ্য করতে আসত।

নৃতত্ত্ববিদরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে বর্বরদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের মানুষেরা পৃথক পৃথক ভাবে থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা চালু করা হয়েছিল আদিমকালের অবাধ যৌনসম্পর্ক বন্ধ করার জন্য এবং ভাই-বোনের মধ্যে যৌন-সংযোগ ঠেকানোর জন্য—এ কথা মনে করার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। ভাই-বোনের মধ্যে যৌনসংযোগ আগে নিয়ম হিসাবেই চালু ছিল। নৈতিকতার স্বার্থেই এই বিচ্ছিন্নতার দরকার হয়েছিল। গোষ্ঠীর পরিধিতে নারী পুরুষের এই বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল বৃত্তির পার্থক্য ও সম্পত্তির ধারণা। সাধারণত পুরুষদের ওপর দায়িত্ব থাকত প্রতিরক্ষার ও খাদ্য সংগ্রহের। আর মেয়েদের দায়িত্ব ছিল খাদ্য তৈরি করা, পোষাক বা গৃহস্থালির বাসনপত্র বানানো, এবং যখন থেকে বাড়ি সৃষ্টি হল, তখন থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।[১] মার্কস

১। ফিসন্‌কে জনৈক কুর্নাই বলেছিল, "পুরুষ মানুষরা শুধু শিকার করে, মাছ ধরে, লড়াই করে আর বসে থাকে", অর্থাৎ বাকি সব কিছুই করে মেয়েরা।

বলেছেন—শ্রম বিভাজন শুরু হয়েছিল এই লিঙ্গের পার্থক্য থেকেই, আর এই পার্থক্যই শ্রম বিভাজনের ভিত্তি। সম্পত্তির সূচনার সময় তা একটিমাত্র লিঙ্গেই আবদ্ধ ছিল।

পুরুষ হচ্ছে শিকারী ও যোদ্ধা। তার ঘোড়া আছে, অস্ত্র আছে। মেয়েদের অধিকারে থাকে গৃহস্থালির বাসনপত্র এবং নিজের বৃত্তির উপযোগী অন্যান্য জিনিস। এইসব জিনিসপত্রকে সে নিজের মাথায় বা পিঠে করে বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য। ঠিক এইভাবেই সে বহন করে নিজের সন্তানকে, যে সন্তান তার নিজের, সন্তানের পিতার নয়, সাধারণত যার পরিচয় অজানা।

কৃষির আবিষ্কার দুটি লিঙ্গের পৃথকীকরণকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবার এটাই ছিল গোষ্ঠীর সার্বজনীন সম্পত্তি, অর্থাৎ জমির বিভাজনের প্রধান কারণ। পুরুষরা যোদ্ধা ও শিকারীই থেকে গেল। চাষের কাজের ভার রইল তাদের স্ত্রীদের ওপর। ফসল কাটার সময় পুরুষরা সাহায্য করত মেয়েদের। পশুপালক জনগোষ্ঠীতে পুরুষরা পশুদের দলগুলিতে দেখাশোনা করার কাজটাই নিজেদের হাতে রাখত। পশুপালনকে কৃষির চেয়ে উন্নততর বৃত্তি বলে মনে করা হত। আর প্রকৃতপক্ষে দুটি কাজের মধ্যে পশুপালন অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর। কাফিররা পশুপালনকে এক অভিজাত বৃত্তি বলে মনে করে। তারা গরুকে বলত 'কালো মুক্তো'। আর্যদের প্রাচীনতম আইনে দেখা যায়—দুটি উচ্চতম শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের (যোদ্ধা) পক্ষে কৃষি সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনাকে মর্যাদাহানিকর বলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। "ধার্মিক ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কৃষিকার্য করাকে নিন্দা করে থাকেন, কারণ লৌহ-নির্মিত লাঙলের ফলায় ধরিত্রী এবং বসবাসকারী প্রাণীরা আহত হয়।"[১]

কোন জিনিসের ব্যবহার কে করে, তা দিয়েই তার মালিকানা নির্দ্ধারিত হয়। সেই হিসাবে, আদিম জাতিগুলির মধ্যে যখন প্রথম ভূমিগত সম্পত্তির সূচনা হয়, তখন তা নারীদের জন্যই বরাদ্দ করা হয়। যে সব সমাজে পরিবারের মাতৃতান্ত্রিক রূপটি টিকে থেকেছে, সেখানেই এই ভূমিগত সম্পত্তি থেকেছে নারীদের হাতে। ঈজিপ্সীয়দের মধ্যে, নায়ারদের মধ্যে, আফ্রিকার মরুভূমির তুয়ারেগ্ আর পীরেনীজের বাসকুয়াদের মধ্যে এই ঘটনা চোখে পড়ে। অ্যারিস্টটলের সময়ে স্পার্টার ভূখণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল নারীদের অধিকারে। ভূ সম্পত্তি শেষপর্যন্ত তার মালিকের মুক্তির এবং সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের উপায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথম যুগে এই সম্পত্তি ছিল তার অধীনতার

১। মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

কারণ। চাষের কঠিন কাজের দণ্ড জুটেছিল নারীদের বরাতে, আর এর হাত থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল গোলামী শ্রম শুরু হওয়ার পর।

কৃষিই জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিয়েছিল। কৃষিতেই শুরু হয়েছিল গোলামী শ্রম। বহু শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় এই গোলামী শ্রমই নানান নাম নিয়েছে—দাস-শ্রম, বেগার-শ্রম এবং মজুরী-শ্রম।

৩

আদিম সাম্যবাদ যতদিন টিকে ছিল, ততদিন গোষ্ঠীর জমিতে চাষ হত সার্বজনীনভাবে। আলেক্সান্দারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ারখুস্, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের নানান ঘটনার যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, বলেছেন, "ভারতবর্ষের কিছু কিছু জায়গায় গোষ্ঠীগুলি বা রক্তসম্পর্কযুক্ত দলগুলি সার্বজনীনভাবে জমি চাষ করত। বছরের শেষে ফল ও ফসল তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতো"।[১]

১০০ জন শ্রমিক নিয়ে গঠিত মায়া ইণ্ডিয়ানদের একটি বসতির কথা উল্লেখ করেছেন ষ্টিফেন, "যেখানে জমি সকলের, চাষও হয় সার্বজনীনভাবে, এবং উৎপাদিত ফসল সকলে ভাগ করে নেয়"।[২]

নিউ মেক্সিকোর তাও নামে এক ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মিষ্টার মিলার মর্গানকে লিখেছেন,—"প্রতিটি পুয়েব্লোতে একটি করে শস্যক্ষেত্র আছে। সকলে মিলে চাষ করে সেখানে। এই শস্য গোলায় রাখা হয়। শস্যের অভাব ঘটলে দরিদ্ররা এই ভাণ্ডার থেকেই সাহায্য নেয়। এই শস্যের দায়িত্ব ও বিলি-বণ্টনের ভার থাকে ক্যাসিকের উপর অর্থাৎ যাকে অধ্যক্ষ বলা হয়।" স্পেন পেরু দখল করার আগে সেখানে কৃষিকাজের প্রতি শ্রমিকদের এক উৎসবসুলভ আকর্ষণ ছিল। সকাল হলে কোন উঁচু জায়গা বা উঁচু বাড়ি থেকে সমস্ত মানুষকে ডাকা হত। ছুটির দিনে পুরুষ, নারী আর শিশুরা তাদের সবথেকে মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করে সমবেত হত। সমস্ত জনতা কাজ শুরু করত। সমস্বরে ইন্‌কাদের শৌর্যের প্রশংসামূলক স্তবগান দিয়ে শুরু হত এবং প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাজ শেষ হত।[৩] সিজারও এই একই কথা বলেছেন যে জার্মান

১। Nearchus apad strabo, lib xv.

২। স্টিফেন, "ইয়ুকাতানে ভ্রমণের ঘটনাবলী," II.

৩। ডব্লিউ. প্রেস্‌কট্, "পেরু বিজয়"।

জাতিগুলির মধ্যে সবথেকে যুদ্ধপ্রিয় ও সবথেকে শক্তিশালী স্থভিরা প্রতি বছর একশটি অঞ্চল থেকে একশজন লোককে যুদ্ধ করতে পাঠাতো। যারা বাড়িতে থাকত তারা বাধ্য থাকত ঐ যুদ্ধযাত্রীদের ভরণপোষণ করতে। পরের বছর ঐ যোদ্ধারা বাড়িতে থাকত আর বাকিরা যেতো যুদ্ধে। সিজার বলেছেন, এইভাবে জমিতে সর্বদা চাষও হত এবং যুদ্ধের অভ্যাসও বজায় থাকত (De Bello Gallico, 8, I।

যে স্ক্যাণ্ডিনেভীয়রা ইওরোপকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তাদের মধ্যেও একই রকম সাম্যবাদী রীতিনীতি চালু ছিল। আর ছিল মিলেমিশে যুদ্ধ বা সমজাতীয় অভিযানের অভ্যাস। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারা ঘরে ফিরে যেতো, ফসল তোলার কাজে সাহায্য করতে নিজেদের স্ত্রীদের। এই সার্বজনীন চাষের মধ্যে দীর্ঘকাল টিকে ছিল আদিম সাম্যবাদের ছাপ। যৌথ বা রক্তসম্বন্ধযুক্ত সম্পত্তি ভিত্তিক রাশিয়ান গ্রামগুলিতে প্রায়শই কিছুটা জমি সার্বজনীন ভাবে চাষ করা হয়। এগুলিকে বলা হয় mirskia zapaschki (গোষ্ঠীর দ্বারা কর্ষিত প্রাস্তর)। উৎপন্ন ফসল বণ্টন করে দেওয়া হয় গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে। অন্যান্য জায়গায় কর্ষনযোগ্য জমিতে যৌথভাবে চাষ করা হয় এবং পরে তা পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় তৃণভূমি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। কিন্তু ডন নদীর পার্শ্বস্থ অঞ্চলের বেশ কিছু জনগোষ্ঠীতে তৃণভূমি এখনও বিভাজিত হয়নি। সেখানে সকলে মিলে ঘাস কাটা হয়। তারপর খড় ভাগাভাগি করা হয়। কিন্তু জঙ্গল সাফাইও করা হয় একযোগে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীগুলিতে সমবায় প্রথায় যে লাঙল দেওয়া ও মাটি কোপানো হয়, তা সম্ভবত সাম্যবাদী কৃষি যুগেরই নিদর্শন। ফিজিতে কোন টুকরো জমি চাষের জন্য তৈরী করার সময় তিন-চার জনের দলে বিভক্ত হয়ে লোকেরা কাজ করে। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা শাবল। দু'ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটা ক্ষেত্রের চারদিকে শাবল দিয়ে আঘাত করে চলে তারা। বারবার আঘাত করতে করতে যখন ১৮ ইঞ্চি গর্ত হয়, তখন শাবলটাকে লিভারের মত করে ব্যবহার করা হয়। জোরে চাপ দিয়ে মাঝের মাটিকে ওপরে তোলা হয়। উর অঞ্চলের মত একই পদ্ধতি দেখা যায় স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে, মিস্টার গোমে একথা উল্লেখ করেছেন।

জার্মানরা কিভাবে প্রতি বছর লুণ্ঠনমূলক অভিযানে যাত্রা করত, তার বিবরণ দিয়েছেন সিজার; সম্ভবত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসমবেত সমস্ত যোদ্ধারা এবং চাষের কাজ করার জন্য যারা বাড়িতে রয়ে যেতো তারা এবং সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের মধ্যে ভাগ

করে দেওয়া হত।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকরা দুঃসাহসী জলদস্যুও ছিল। তারা ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াতো এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে পালিয়ে যেত নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ে। সমুদ্রের কোন পাহাড়ের ওপর তৈরী এই আশ্রয়স্থল ছিল যেন কোন ঈগল পাখির বাসা। জলের মাঝে গড়ে ওঠা এই আশ্রয়স্থলগুলি ছিল স্কাণ্ডিনেভিয়ানদের গোলাকৃতি টাওয়ারের মতই দুর্ভেদ্য। 'স্কলিয়ন্ অফ হাইব্রিয়াস্' নামক একটি গ্রীক গানের চমৎকার একটি অংশ থেকে আমরা গ্রীকদের বীরত্বপূর্ণ জীবনের একটা চিত্র পাই। নায়ক বলছেন, আমার সম্পদ বলতে আছে একটা বিশাল বর্শা, একখানা তরবারি আর এই ঢালখানি যা আমার শরীরের দেয়াল। এইসব দিয়ে আমি চাষ করি জমি বপন করি বীজ আর আঙুরের মিষ্ট রস থেকে প্রস্তুত করি সুরা। এইসবের জন্যই তো আমাকে মৃনইয়াদের (গোষ্ঠীর দাসদের) প্রভু করা হয়েছে। যারা বর্শা আর ঢাল হাতে না নেওয়ার দুঃসাহস দেখায়, তারা নতজানু হয়ে বসবে আমার সামনে, কারণ আমি প্রভু এবং তারা ডাকবে আমাকে মহান রাজা নামে।"

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের এক জনপ্রিয় বৃত্তি ছিল জলদস্যুতা। নেস্টর তাঁর অতিথি টেলেমেকাসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে সে জলদস্যু কি না (অডিসি, III)। এথেন্সে জলদস্যুদের একটা কলেজ চালাতেন সোলোন (গেইয়াসদের প্রতিষ্ঠান), এবং থুসিডিডিস বলেছেন যে প্রাচীন কালে জলদস্যুতা সম্মানজনক বৃত্তি ছিল (I, পরিচ্ছেদ ৫)।

বীরেরা যেখানেই যেতো, সেখান থেকেই তারা পুরুষ, নারী, গবাদি পশু শস্য ও অস্থাবর সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে আসত। ধৃত পুরুষরা দাস ও সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হত। আর নারীরা তাদের তত্ত্বাবধান করত, আর ঐ গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের হয়ে তারা জমিতে চাষ করত। এই সাহসী জলদস্যুরা প্রথম যে দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, ক্রীট্ তার অন্যতম। ক্রীটের প্রত্যেকটি শহরে অ্যারিস্টটলের সময় পর্যন্ত দাসবাহিনী থাকত, এদেরকে বলা হত মিনোট (mnotie)। এরা সার্বজনীন এলাকাগুলিতে চাষের কাজ করত। গ্রীসের শহরগুলিতে সার্বজনীন এলাকার পাশাপাশি সার্বজনীন ভোজও চালু ছিল ঠিক যেরকম ভোজের বর্ণনা দিয়েছিলেন হেরাক্লিডস্।[১]

১। গ্রীসের দাসরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—রাষ্ট্রের অধীন সার্বজনীন দাস, আর ব্যক্তির অধীন দাস, যাদেরকে বলা হত ক্লোরোতেস্, অর্থাৎ, ভাগে

১৮৩০ সালে মিষ্টার হগ্‌সন্‌ মাদ্রাজ থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক গ্রামের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এই গ্রামের বাসিন্দাদেরকে তাদের চাষের কাজে সাহায্য করত দাসরা, আর এই দাসরা ছিল সার্বজনীন সম্পত্তি। গ্রামবাসীরা যখন তাদের নানান জিনিস বিক্রি করত বা বন্ধক রাখত, তখন অন্যান্য জিনিস পত্রের সঙ্গে এই দাসরাও হস্তান্তরিত হত। মধ্যযুগীয় শহরে, এমনকি গ্রামেও সার্বজনীন ভূমিদাস দেখা যেতো।[২]

কাজেই, দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই জমি, তার ফসল, গৃহপালিত পশু, ভূমিদাস ও ক্রীতদাস—সবধরনের সম্পত্তিই প্রথমে ছিল গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সাধারণ সম্পত্তি। মানবজাতির শৈশব আশ্রয় নিয়েছিল সাম্যবাদের কোলে। আর বর্তমান সভ্যতা এই আদিম সাম্যবাদকে ধ্বংস করেছে। অভিজাত ও বুর্জোয়াদের লোলুপতার মুখোমুখি টিকে রয়েছে শুধু গোষ্ঠীগত জমিগুলি—আদিম সাম্যবাদের অন্তিম নিদর্শন। কিন্তু সভ্যতার কাজ দ্বি-মুখী: একদিকে যেমন সে ভাঙে, অপরদিকে তেমনি পুনর্গঠন করে। আদিম মানুষের সাম্যবাদী কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে সৃষ্টি করেছে এক উন্নততর, জটিলতর সাম্যবাদের উপাদানসমূহ।

ধ্বংস এবং পুনর্গঠন সভ্যতার এই দ্বি-মুখী গতিপথকেই আমি এখানে অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

পাওয়া। এথেন্সে কিছু সার্বজনীন দাস ছিল যারা চাষের কাজ করত না। এরা জল্লাদ, রক্ষীবাহিনীর গুপ্তচর এবং প্রশাসনের অধস্তন কর্মচারী হিসাবে কাজ করত।

২। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য-বিবরণী, ১৮৩০, খণ্ড ২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১ পরিবার অথবা রক্তসম্বন্ধযুক্ত যৌথতন্ত্র

পরিবার গড়ে উঠতে শুরু হওয়ার ফলে সার্বজনীন গোষ্ঠীগত সম্পত্তিতে ভাঙন দেখা দেয়। পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার, যাতে করে সম্পত্তির বিবর্তন সম্বন্ধে পাঠক আরও স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে পারেন।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই প্রধান, সম্পত্তির অধিকারী তিনিই, এবং সন্তানরা তাঁর নামই বহন করে। এখন আমরা জেনেছি যে এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পৌছনোর আগে মানবসমাজ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখেছে, যেখানে মাতাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। আমরা পূর্বেই দেখেছি বিরাট বিরাট যৌথ বসত-বাড়ীতে বাস করত সমগ্র গোষ্ঠী, যেখানে কয়েকটি ঘর নির্দিষ্ট থাকত বিবাহিতা নারীদের জন্য। ব্যক্তিগত পরিবার তখন সদ্যোজাত অবস্থায়। মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার পর দেখা যায়— যতগুলি পরিবার ততগুলি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ঐ গোষ্ঠীগত বাড়িগুলি। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মা তার সন্তান আর অনুজ ভাই-বোনদের নিয়ে বাস করে। তার স্বামীরা অন্য এক গোষ্ঠীর পুরুষ, পালাক্রমে তারা আসে তার কাছে। এই সময়ই পারিবারিক সম্পত্তির জন্মের সূত্রপাত হয়।

পারিবারিক সম্পত্তির সূচনাটা নিছক সাদামাটা। কারণ প্রথমে ছিল শুধু থাকার ঘর আর তার চারপাশে ছোট্ট একফালি বাগান। কোন কোন জায়গায় হয়ত পারিবারিক সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পেরিয়ে গড়ে উঠেছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু এটা বিশ্বজনীন ঘটনা নয়। বরং দেখা যায় যে পারিবারিক সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়ার পর এক বিপ্লব ঘটে গেছে পরিবারের মধ্যে। ঈজিপ্টে, গ্রীসে এবং অন্যান্য বহু জায়গায় বিকাশের প্রতিপথ ছিল স্বাভাবিক, সভ্যতার উচ্চতর স্তরে নানান রাষ্ট্রের আক্রমণের ফলেও তা ছিল অব্যাহত।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার যতদিন টিকে থাকবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ততদিন

নারীদের কাছ থেকেই বর্তাবে। উত্তরাধিকারসূত্রে কোন মানুষ তার মায়ের কাছ থেকেই, কিছু পায় বাবা বা বাবার আত্মীয়দের কাছ থেকে পায় না। জাভায় এই ধরণের পরিবার বিকাশের উচ্চ স্তরে পৌছেছিল। সেখানে প্রত্যেকের সম্পত্তি পুনরায় তার মায়ের পরিবারে ফিরে আসে। ভাই-বোনদের অনুমতি বা মতামত না নিয়ে মায়ের গোষ্ঠীর কোন জিনিস নিজের সন্তানকেও দান করতে পারে না কারণ সন্তানরা তার স্ত্রীর গোষ্ঠীর সদস্য। ঈজিপ্ট ও অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্থান অত্যন্ত হীন। খ্রীষ্ট ধর্ম ও সভ্যতার আগমন সত্ত্বেও বাসকুরা নিজেদের আদিম রীতিনীতি বজায় রাখতে পেরেছে। এই বাসকুদের মধ্যে মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিণী হয় জ্যেষ্ঠা কন্যা, আর সেইসঙ্গেই সে তার অনুজ ভাই-বোনদেরও অভিভাবক হয়ে ওঠে। পুরুষরা তাদের নিজের পরিবারের অভিভাবিকার অধীন। বোনের অনুমতি নিয়ে যখন সে বিবাহ করার জন্য "চলে যায়", তখন সে হয়ে পড়ে তার স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কখনও পুত্র, কখনও ভাই, আবার কখনও স্বামী হিসাবে সে সারা জীবনই নারীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তার বিবাহের সময় তার বোন যে সামান্য কিছু জিনিস তাকে দেয়, সেটুকু ছাড়া তার নিজের বলতে আর কিছুই থাকে না। বাসকুদের প্রবচনে আছে, "স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর প্রধান ভৃত্য।"

আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়।—পরিবারে নারীদের এই উচ্চ অবস্থান থেকে এটা পরিষ্কার যে পুরুষদের শারীরিক ও মননগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শুধুমাত্র কোন শারীরতাত্ত্বিক বাস্তবতা নয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব আসলে শত শত বছর ধরে পোক্ত হয়ে ওঠা এক আর্থনীতিক পরিস্থিতিরই ফলাফল। নারীরা বাঁধা পড়েছিল পারিবারিক বাঁধনে। ঐ আর্থনীতিক পরিস্থিতি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অবাধতর ও পরিপূর্ণতর বিকাশের সুযোগ দিয়েছিল। বুদ্ধিমত্তারসঙ্গে মস্তিষ্কের ওজন ও করোটির ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে গ্র্যাটিওলেট্-এর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রকা স্বীকার করেছিলেন যে নারীদের নিকৃষ্টতা হয়তবা নিকৃষ্ট শিক্ষারই পরিণতি। ব্রকার ছাত্র এবং প্যারিস স্কুল অফ অ্যান্থ্রোপলজির অধ্যাপক এম ম্যানুভ্রিয়ের ব্যাখা করে বলেছেন যে প্রস্তর যুগের পুরুষদের করোটির পরিমাপ আধুনিক প্যারিবাসীদের গড় করোটির পরিমাপের প্রায় সমান ছিল, অথচ প্রস্তর-যুগের নারীদের করোটির পরিমাপ প্যারির আধুনিক মহিলাদের করোটির পরিমাপের

চেয়ে অনেক বেশিই ছিল।[১]

নারীদের প্রতি এই হীনতার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকরভাবে মানবজাতির ওপর পড়েছে। সভ্য জাতিগুলির অধঃপতনের এটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সব দেশেই নারীদের কর্তৃত্ব যে ঈজিপ্টের মত বিরাট আকার নিয়েছিল, এমন দাবী না করেও নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যেখানেই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে উঠেছে, সেখানেই পুরুষদের নারীদের ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা গেছে। আর প্রায়শই এর সঙ্গে মিলে গেছে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত এই দুই লিঙ্গের মধ্যেকার বিদ্বেষের ভাব। স্তাৎ শেজ্ এবং মিসিসিপি উপত্যকার সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে 'নারী' (woman) শব্দটা পুরুষদের প্রতি ব্যবহার করা হত প্রকাশ্যে অপমান করার জন্য। হেরোডোটাস লিখেছেন, যে 'নিজের গৌরবময় সাফল্যের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য বিজিত দেশগুলিতে নানান বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন সেসোস্ত্রিস্। যে সব দেশ তাঁকে কোনরূপ বীরত্ব প্রকাশ করে বাধ দেয়নি, তাদের প্রতি নিজের ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন তিনি এক বিচিত্র উপায়ে। তাদের কাপুরুষতার প্রতীক হিসাবে ঐসব বিজয়স্তম্ভে একটি করে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় খোদাই করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।' হোমারের যুগের কোন গ্রীককে 'নারী' সম্বোধন করা ছিল চরম অপমানজনক ব্যাপার। আবার দাহোমে উপজাতির যুদ্ধপ্রিয় নারীরা 'পুরুষ' শব্দটা ব্যবহার করে কোন ক্ষতিকর ব্যাপার বোঝানোর জন্য। কোন সন্দেহ নেই যে নারীদের এই কর্তৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া

১। নিচের হিসাবটি দিয়েছেন এম. ম্যানুভ্রিয়ের :

আধুনিক প্যারিবাসীদের করোটির পরিমাপের গড়।

পরিমাপ করা করোটির সংখ্যা।	পরিমাপ—ঘন সেন্টিমিটারে।
৭৭-টি পুরুষ	১৫৬০
৪১-টি নারী	১৩৩৮

প্রস্তরযুগের পুরুষ ও নারীর করোটির পরিমাপের গড়।

৫৮-টি পুরুষ	১৫৪৪
৩০-টি নারী	১৪২২

দেখা যাচ্ছে, বর্বর পুরুষদের গড় করোটি ক্ষমতা ২৬ ঘন সেন্টিমিটার কম, আর বর্বর নারীদের গড় করোটি ক্ষমতা ৮৪ ঘন সেন্টিমিটার বেশি—এম. ম্যানুভ্রিয়ের। "De la guantite' de I' encephale",—Memoire de le Society d' Anthrologic de paris, III, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৫.

আর ঐ বিদ্বেষের জ্বালা মেটানোর আকাঙ্খাই নারীদের হাত থেকে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য পুরুষদের প্ররোচিত করেছিল।

যখন ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং গড়ে উঠেছিল পারিবারিক ভূ-সম্পত্তি, প্রবহমান কাল এবং সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা যা একসময় গ্রহণ করেছিল পূতপবিত্র রূপ—তখনই সম্ভবত ঘটেছিল এই পারিবারিক বিপ্লব। তখনকার মত নারীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পেরেছিল পুরুষরা। পুরুষরা নির্মম বল প্রয়োগের দ্বারা কেড়ে নিয়েছিল নারীদের অধিকার ও ক্ষমতা। অবশ্য দেশ অনুযায়ী এই নির্মমতার তারতম্য ছিল। ল্যাসিডিমোনিয়ায় নারীরা তাদের স্বাধীনতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছিল (এই কারণেই অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে সবথেকে যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলির মধ্যেই নারীদের সর্বাধিক কর্তৃত্ব ছিল), আবার এথেন্সে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দর শহরগুলিতে তাদেরকে বলপূর্বক অধিকারচ্যুত করা হয়েছিল। এই অধিকারচ্যুতির গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল নানান বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল নারীরা, শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড সংগ্রাম। এই আশ্চর্য সংগ্রামের স্মৃতি সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে সমগ্র গ্রীক পুরাণ কাহিনীতে এবং এমনকি লিখিত ইতিহাসেও।

যতদিন পর্যন্ত সম্পত্তি ছিল অধীনতার উৎস, ততদিন তা ছিল নারীদেরই হাতে। কিন্তু একদিন এই সম্পত্তিই হয়ে উঠল পরিবার ও সমাজে মুক্তি আর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপায়। তখনই হাত বাড়াল পুরুষরা, নারীদের কাছ থেকে কেড়ে নিল সম্পত্তির অধিকার।

এখানে এই বিবর্তনের খুব গভীরে প্রবেশ করছি না; শুধু একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চাই। যেখানে বা যেভাবেই পরিবার গড়ে উঠে থাকুক না কেন, মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক রূপেই হোক, একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে পরিবার গঠনই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাম্যবাদকে ধ্বংস করেছিল। প্রথম যুগে গোষ্ঠী ছিল তার সদস্যদের সাধারণ পরিবার। তারপর দেখা দিল ব্যক্তিগত পরিবার। এই পরিবারগুলির যোগফলস্বরূপ ছিল যে গোষ্ঠী, তার স্বার্থ আর এই ব্যক্তিগত পরিবারের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। গোষ্ঠীর যৌথ এলাকা (Communal territory) টুকরো টুকরো হয়ে গেল, গড়ে উঠল প্রতিটি পরিবারের 'যৌথ সম্পত্তি' (Collective property)।[১]

১। সম্পত্তির এই রূপটি, যাকে 'যৌথ সম্পত্তি' এই অভিধাটি ছাড়া অন্য যে অভিধাটি আমি আদিম সাম্যবাদী সম্পত্তির রূপের সাথে পার্থক্য বোঝাতে

যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে যে ধরণের পরিবার গড়ে উঠেছিল, আজকের ইউরোপীয় পরিবার কিন্তু সে ধরনের নয়। পূর্বেকার সেই পরিবার তার শেষ ও সরলতম অবস্থায় গিয়ে পৌছয়নি, কিন্তু আজকের দিনের পরিবার এসে দাঁড়িয়েছে নিজের সেই শেষ ও সরলতম অবস্থাটিতে। আজকের দিনের পরিবার তিনটি অপরিহার্য উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে : পিতা মাতা এবং তাদের সন্তানাদি। আর পূর্বেকার সেই পরিবারে থাকত পারিবারিক যৌথের স্বীকৃত প্রধান, অর্থাৎ পিতা; তার বৈধ স্ত্রী এবং উপপত্নীরা—একই ছাদের তলায় যাদের বসবাস এবং তার সন্তানরা, স্ত্রী এবং সন্তানসহ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, এবং তার অবিবাহিতা ভগ্নীরা। বহু সদস্য নিয়ে গড়ে উঠত এই ধরনের পরিবার।

২

কর্ষণযোগ্য জমিতে এতদিন পর্যন্ত সমগ্র গোষ্ঠী সার্বজনীনভাবে চাষ করত। জমির গুণ অনুযায়ী এবার তা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এমনভাবে ভাগ করা হল, যাতে প্রতিটা ভাগে বিভিন্ন ধরনের জমি সমান পরিমাণে থাকে। যতগুলি পরিবার, ততগুলি ভাগ। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বাড়বে, তাই কিছুটা জমি আলাদা করে রাখা হত এবং এই জমিটা ইজারায় দেওয়া হত, কিম্বা চাষ করা হত যৌথভাবে। যাতে কোন অন্যায় না হয় বা কোন অভিযোগ না ওঠে, তার জন্য ঐ জমির ফসল ভাগ করা হত লটারির সাহায্যে।[২] তাই দেখা যায়, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় যে শব্দগুলি দিয়ে লটারি বোঝানো হয় (sors, cleros), সেই শব্দগুলি দিয়েই মালপত্র ও পৈত্রিক সম্পত্তিও বোঝানো হয়।
কোন পরিবার অন্যায়ের অভিযোগ তুললে তার তদন্ত করা হত। তদন্তে তাদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণিত হলে প্রতিবিধান হিসাবে সংরক্ষিত জমির

ব্যবহার করেছি, তাই নিয়েই বিগত কয়েক বছর ধরে বিস্তৃত গবেষণা চলছে। জার্মানীতে গবেষণা করেছেন হাক্স্টহউসেন, মরার, এঙ্গেলস প্রমুখ ; ইংল্যাণ্ডে মেইন, সীবহ্ম্, গমে প্রমুখ ; বেলজিয়ামে লেভ্লে ; রাশিয়ায় স্চেপোতিরেফ্, কোভালেস্কি প্রমুখ।

২। লটারির সাহায্যে জমির ভাগাভাগি করা বণ্টনের আদিম পদ্ধতি হিসাবে সর্বত্রই চালু ছিল। "ক্যানানের দেশে প্রবেশ করে ঈশ্বর ইস্রায়েলের সন্তানদের নির্দেশ দিলেন লটারির দ্বারা জমি ভাগ করার"। (সংখ্যা xxxiii, ৫৪; xxxvi, ২)।

আরও কিছু অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হত। জমির এই ভাগাভাগির পদ্ধতি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ওদের মধ্যেকার সমতার মনোভাব এবং জমি-জরিপকারী কৃষকের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। হাক্স্টহউসেন বলেছেন যে কিভাবে কাউণ্ট দ্য কিন্‌স্লেফ—সাম্রাজ্যের ভূসম্পত্তি মন্ত্রী, ভোরোনেজ সরকারের বেশ কিছু অঞ্চলে জমির খাজনা-আদায়কারী ও জরিপকারীদের দিয়ে জমির খাজনা নির্দ্ধারণ ও জরিপ করিয়েছিলেন। দেখা গিয়েছিল যে দু'একটা ছোটখাট ভুলচুক ছাড়া সবদিক থেকেই কৃষকদের হিসাব মূল হিসাবের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আর, ঐ মূল হিসাব আর কৃষকদের হিসাব—দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশি সঠিক, তা কে বলতে পারে ?[১]

চারণভূমি, বনভূমি, হ্রদ ও পুকুর, শিকার করা ও মাছ ধরার অধিকার এবং অন্যান্য অধিকার, যেমন ব্যবসায়ী এবং যাত্রীদলগুলির কাছ থেকে আদায় করা শুল্ক ইত্যাদি—এগুলি গণের (clan) সকল সদস্যের যৌথ সম্পত্তি।

পরিবারের প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী আর গ্রাম-পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি পরিবার নিজের নিজের জমির ভাগটুকু চাষ করে। আগে উৎপন্ন ফসল সমগ্র গোষ্ঠী বা গণের সম্পত্তি হত, কিন্তু এখন এই ফসল যে পরিবার উৎপন্ন করেছে, তাদের যৌথ সম্পত্তি। কিন্তু কোন পরিবার নিজেদের খেয়াল-খুশিমত তাদের জমিতে চাষ করতে পারে না। মার্শাল বলেছেন—"গোষ্ঠীর অন্যান্য পরিবার যে বীজ বপন করবে, তাদেরকেও সেই বীজই বপন করতে হবে।" [২]

চাষের ব্যবস্থা এক ত্রৈবার্ষিক চক্র : (১) ধান জাতীয় শস্য বা রাই (২) রবিশস্য (বার্লি, ওট, বীন, মটর ইত্যাদি) (৩) অনাবাদি। শুধু কোন্ বীজ বুনতে হবে তা-ই নয়, বপন করা ও ফসল কাটার সময়ও নির্দ্ধারণ করে দেয় গোষ্ঠী-পরিষদ। স্যর জি. ক্যাম্পবেল লিখেছেন যে প্রতিটি ভারতীয় গ্রামে পঞ্জিকা থাকে—ব্রাহ্মণ বা জ্যোতিষীরা বলে দেয়, বীজ বপন ও ফসল তোলার পক্ষে শুভ সময় কোন্‌টা। রাশিয়ার যৌথ কমিউনের রীতিনীতিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ও নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন হাক্স্টহউসেন। তিনি লিখেছেন যে

১। "Etudes sur La situation intérieure, la vie nationale et les institutions de la Russie", par le Baron. A de Haxtthusen ১৮৪৭ ফরাসী সংস্করণ।

২। মার্শাল। "স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক প্রাথমিক ও ব্যবহারিক প্রবন্ধ", লণ্ডন, ১৮০৪.

"সামরিক শৃঙ্খলার মতই এক অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা দেখা যায় চাষের কর্মীদের মধ্যে। একইদিনে, একই সময়ে কৃষকরা জমিতে হাজির হয়। কেউ লাঙল দেয়, কেউ বা মই দেয় জমিতে। ফেরার সময় সকলে একসঙ্গেই ফেরে। স্তারোস্তা বা গাঁও-বুড়োর নির্দেশ থেকে কিন্তু এই শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয় না। এর উৎস হল রাশিয়ার মানুষের নিজস্ব যূথচারী মনোভাব এবং একতা ও শৃঙ্খলার প্রতি ভালবাসা, যা প্রেরণা যোগায় কমিউনকে।" হাক্স্টহউসেন ভেবেছিলেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু রাশিয়ার মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু আসলে এইসব বৈশিষ্ট্য সম্পত্তির যৌথ রূপেরই ফলাফল, আর পৃথিবীর সর্বত্রই এগুলি দেখা গেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয়রা কোন মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী বীজবপনের কাল নির্দ্ধারণ করে না। তারা নির্ভর করে জ্যোতিষী-কথিত গ্রহ-নক্ষত্র সংক্রান্ত বিচারের ওপর। ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারের আইনজ্ঞ হিসাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখার—জানার সুযোগ পেয়েছিলেন মেইন্। তিনি লিখেছেন :—

"গ্রামের বয়স্কদের পরিষদ কখনও কোন নির্দেশ দেয় না। বরাবরই যা ছিল, সেটুকুই শুধু ঘোষণা করে তারা। কোন উচ্চতর শক্তি যে নির্দেশ দিয়েছে বলে পরিষদ মনে করে, তা-ও তারা সাধারণত ঘোষণা করে না। এই বিষয় সম্বন্ধে যাঁরা সবথেকে বেশি ওয়াকিবহাল, তাঁরা বলেন যে নিজেদের রীতিনীতির ভিত্তি হিসাবে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কাছে কোন ঐশ্বরিক বা রাজনীতিক কর্তৃত্ব অত্যাবশ্যক নয়। ঐসব রীতিনীতিকে মান্য করার জন্য সেগুলির প্রাচীনতাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। আইনের চোখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য বলে কিছু নেই। অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষের অন্যায়ের সম্বন্ধে অভিযোগ করে না, অভিযোগ করে ঐ সমগ্র ছোট্ট সমাজটার শৃঙ্খলার গোলযোগ সম্বন্ধে।"[১]

হাক্স্টহউসেন যে শৃঙ্খলার কথা বলেছেন, তা এক স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা। কিন্তু কোন সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলামাফিক চলাচল অথবা উত্তর আমেরিকার খনিজ দ্রব্যের ফার্মের শ্রমিকদের শৃঙ্খলাযুক্ত কার্যকলাপ হলো হুকুমমাফিক। গত শতাব্দীর এক সুইস্লেখক লিখেছেন যে কাজের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মত একই ধরনের শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও উৎসাহ দেখা যেত সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন অঞ্চলে। তিনি লিখেছেন, "কোন এক নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় অঞ্চলের সমস্ত মানুষ হাজির হত গোষ্ঠীগত তৃণভূমিতে। নিজের নিজের ক্ষেত্র বেছে নিত প্রত্যেকে। তারপর মাঝরাতে

১। এইচ. এস. মেইন্, "প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী", পৃঃ ৬৮

পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে আসত সঙ্কেত। শুরু হত কাজ। যে যার নিজের সামনে সরলরেখায় থাকা ঘাসের সারি কেটে চলত। পরদিন দুপুর পর্যন্ত যে যতটা ঘাস কাটতে পারত, ততটা ঘাস সে পেত। কাজের শেষে গৃহপালিত পশুদের ছেড়ে দেওয়া হত জমিতে। অবশিষ্ট ঘাসটুকু খেয়ে-মাড়িয়ে শেষ করত তারা।"[১]

ফসল তোলা হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন পরিবারের পৃথক পৃথক জমিগুলি আবার সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হত। গ্রামবাসীরা তাদের গরু-ছাগল অবাধে পাঠাতে পারত ঐসব জমিতে।

প্রথমদিকে গোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিবারের পিতারাই শুধু একএকটি ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিল। পরবর্তীকালে, বহিরাগত বসবাসকারীরা ও কিছুদিন ঐ অঞ্চলে থাকার পর নাগরিক অধিকার লাভ করত, এবং জমির ভাগ পেত। স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ছিল পিতারা, আর তা থেকেই এসেছে patria বা পিতৃভূমি শব্দটি। স্ক্যাণ্ডিনেভিয় আইনে গৃহ আর পিতৃভূমি সমার্থক। সেই সময় কোন মানুষের জমির ভাগ পাওয়ার অধিকার থাকলে তবেই সে patria ও রাজনীতিক অধিকার পেত। ফলস্বরূপ, দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকত শুধু পিতা ও পরিবারের পুরুষদের ওপর। অস্ত্র ধরার অধিকার ছিল শুধু তাদেরই। পুঁজিবাদের অগ্রগতি দেশরক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়েছে এমন সব মানুষের হাতে, যাদের এক ইঞ্চিও জমি নেই, দেশের মাটিতে যাদের কোন শিকড় নেই। একেবারে সম্পত্তি-হীন লোককেও রাজনীতিক অধিকার দিয়েছে পুঁজিবাদ।

জমি তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি, কারণ তা গোটা গ্রামের দখলে। শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় ঐসব জমি। তাতেও শর্ত থাকত—চালু প্রথা অনুযায়ী চাষ করতে হবে, গাঁওবুড়োদের তদারকি মেনে চলতে হবে। ঐসব প্রথা ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা দেখাশোনা করার দায়িত্ব থাকে গাঁওবুড়োদের ওপর। পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে একমাত্র ছোট্ট বাড়িখানা। কোথাও কোথাও, যেমন নিওক্যালেডোনিয়ানদের মধ্যে, কোন

১। "Essai surl' abolition du parcours et sur le partage des biens communaux", par Sprungli de Neuenegg ; public par la Societe D'Economic rurale de Berne (1763), cite par Neufchateau, dans son Voyage agronomique dans la Senatorerie de Dijon, 1806.

পরিবারের প্রধানের মৃত্যু হলে তার বসতবাড়িটি পুড়িয়ে ফেলা হত, আর সেই সঙ্গেই পোড়ানো হত তার অস্ত্রশস্ত্র, প্রিয় পশু, এবং কখনো কখনো তার দাসদেরও। মনে হয়, অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গৃহকে দীর্ঘকাল জমির থেকে আলাদা করে দেখা হত। ফ্রান্সে, লিল্-এ এবং আরও বহু জায়গায় গৃহকে এই-ভাবেই দেখা হত।

ইচ্ছামত প্রবেশযোগ্য নয় কারো বাড়ি। মালিকের অনুমতি না নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। দেশের আইন বাড়ির দোরগোড়াতেই শেষ। কোন অপরাধী বাড়িতে প্রবেশ করলে, বা এমনকি স্রেফ দরজার কড়াতে হাত লাগালেই, রাষ্ট্রীয় আইন আর তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। সে তখন ঐ পরিবারের পিতাটির কাছে দায়বদ্ধ। বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে এই পিতাই বিচার করা ও শাস্তি দেওয়ার অধিকারী। ১৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমান সিনেট কিছু রোমান মহিলাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। এই মহিলাদের গুপ্ত অনুষ্ঠান জনসাধারণের নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। কিন্তু ঐ প্রাণদণ্ড কার্যকর করার ভার ঐসব মহিলাদের পরিবারের প্রধানের ওপর দিতে সিনেট বাধ্য হয়েছিল। কারণ পরিবারের সদস্যা হিসাবে নারীরা শুধু পরিবার-প্রধানের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। এই পারিবারিক অপ্রবেশ্যতা রোমে এমন চরমে পৌছেছিল যে পুত্র বিদ্রোহ করলে পিতা কোন বিচারক বা রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য চাইতে পারত না। বাসগৃহের এই অলঙ্ঘনীয়তা মধ্যযুগেও টিকে ছিল। যেমন, মাল্-হাউসে নিজের বাড়িতে বসে-থাকা কোন নাগরিকের ওপর নগরের আইন প্রযোজ্য ছিল না। তার বিচার করার দরকার হলে আদালতই হাজির হত তার দুয়ারে। আদালত প্রশ্ন করত জানলা দিয়ে। সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দরজা খুলত লোকটি। চার্চের হাতে কাউকে আশ্রয় দেওয়ার যে অধিকার থাকে, তা গৃহের এই অলঙ্ঘনীয়তারই এক রূপান্তর মাত্র। পরে আমরা দেখতে পাবো যে পূর্বে চার্চ ছিল আসলে এক ধরনের সার্বজনীন গৃহ।

বাসস্থানগুলি একে অপরের পাশাপাশি নয়। বাড়িগুলির চারপাশে কিছুটা করে ফাঁকা জমি থাকে। ট্যাসিটাস এবং পরবর্তী বহু লেখকের মতে, আগুনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হত। কাঠের বাড়ি, খড়ের চাল—আগুন তো সেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে আমার মতে এ প্রথার কারণ খুঁজতে অন্য কোথাও দৃষ্টি দিতে হবে। দেখা গেছে যে একটি গোষ্ঠীর এলাকার (Tribal territories) চারদিকে থাকত কিছুটা করে অনাবাদী জমি, আর ঐ জমি দিয়েই পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীগুলির সীমানা বোঝানো হত। একইভাবে,

পরিবারগুলির আবাসের চারপাশে কিছুটা করে পোড়ো জমি থাকে, সন্নিহিত বাড়িগুলির থেকে ঐ বাড়িটির স্বাতন্ত্র্যই বোঝানো হত। পরবর্তীকালে এই জমিতেই বেড়া, দেওয়াল বা ঝোপের সারি লাগানো যেতো। বর্বরদের আইনে একে বলা হয় বৈধ, ন্যায্য অঙ্গন (Curties ligalis, hoba legitima)। এখানেই বানানো হত পারিবারিক কবরখানা। বাড়িগুলিকে পৃথক পৃথক করে রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌-এর রোমান আইনে ঠিক করা হয় যে শহরের প্রতিটি বাড়ির পাশে আড়াই ফুট করে জমি ফাঁকা রাখতে হবে।[১]

শুধু বাড়িগুলিকেই পৃথক পৃথক রাখা হত না, পৃথক রাখা হত প্রতিটি পরিবারের জমিকেও। কাজেই, আগুন-ভীতির কথাটা খাটে না। টুয়েলভ্‌ টেব্‌ল্‌-এর আইনে বলা হয় যে পাঁচফুট চওড়া জমি অকর্ষিত রাখতে হবে (টেব্‌ল্‌ Vii, অধ্যায় ৪)।

গোষ্ঠীর সার্বজনীনসম্পত্তি (Common property)গোষ্ঠীর পরিবারগুলির যৌথ সম্পত্তিতে (Collective property) পরিণত হয়েছিল। এটা এক মৌলিক পরিবর্তন, এবং আজকের দিনে যদি সব স্থাবর সম্পত্তি যদি গোষ্ঠীর হাতে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও ঠিক অত বড় পরিবর্তন হবে না। অসীম ক্রূরতার পথ বেয়ে যৌথ সম্পত্তির জন্ম হয়েছিল, ঐশ্বরিক শক্তির আড়াল নিয়ে এবং সৃষ্ট আইনের আশ্রয়ে থেকে সে টিকে আছে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় যে যৌথ সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্যই আইন আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর বিচার মানে ঘুরিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। মানবসমাজে বিচারের জন্ম সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পর। লক্‌ বলেছেন, "যেখানে সম্পত্তি নেই, সেখানে কোন অবিচারও নেই—ইউক্লিডের যে কোন প্রতিজ্ঞার মতই এটা নিশ্চিত। কারণ সম্পত্তির ধারনার অর্থ হচ্ছে কোন কিছু সম্বন্ধে অধিকারের ধারণা, আর অবিচারের ধারণার অর্থ হচ্ছে ঐ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা বা তাকে লঙ্ঘন করা।"[২] সুরসিক মঁতেস্কু বলেছেন, "L'esprit des lois, c'est l'esprit de la propriete".

যৌথভাবে পরিবারের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার জন্যই চালু করা হয়েছিল নানান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব। অথচ, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল তাদের সাম্যবাদী রীতি-

১। টেব্‌ল্‌ VII, অধ্যায় ১. যেন্তাম্‌-এর পরে পুনরুদ্ধার করা পাঠ।

২। লক্‌, "মানবিক উপলব্ধি বিষয়ক রচনা", খণ্ড ৪, পরিচ্ছেদ ৩, প্যা ১৮.

নীতির একেবারে বিপরীত। গ্রীস ও ইতালিতে মাস ও বছরের নির্দিষ্ট দিনে পরিবার-প্রধান ঐ অকর্ষিত সীমানা দিয়ে তার জমির চারপাশে প্রদক্ষিণ করত। বলির পশুগুলিকে সে ঠেলে দিত সামনে। স্তবগান করত। জমির খুঁটি, পাথর, সীমানা ও চতুষ্পার্শকে দেবতা হিসাবে কল্পনা করে সেগুলিতে বলির অর্ঘ্য দিত সে। এগুলিই ছিল রোমানদের দেবমূর্তি (Termini) আর গ্রীকদের "দিব্য সীমানা"। কৃষক কখনও জমির সীমারেখার দিকে এগোতো না, "কারণ তাহলে হয়ত দেবতার গায়ে লাঙলের ফলার আঘাত লাগতে পারে, আর তিনি চিৎকার করে উঠতে পারেন, 'থামো, এটা আমার জায়গা, ওদিকটা তোমার'!" প্রতিবেশীর জমিকে শ্রদ্ধা করা সম্বন্ধে বাইবেলে ভূরি ভূরি কথা বলা হয়েছে : "কখনো আপন প্রতিবেশীর জমির সীমানা-চিহ্ন সরাবে না" (ডিউট্যারনমি, xix, 14)। "আপন প্রতিবেশীর জমির সীমানা-চিহ্ন যে সরাবে, তার সর্বনাশ হবে"। জব, যার আত্মা ছিল পাপিষ্ঠদের অন্যতম এক জমিদারের, যে লোক "অন্যের জমির সীমানা-চিহ্ন সরায়",[১] (Job XXIV)। অন্য লোকেদের সম্পত্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সঞ্চার করার জন্য কশাকৃরা তাদেরকে জমির সীমানা দিয়ে নিজেদের সন্তানদের বেড়াতে নিয়ে যায়, আর সারাটা রাস্তা তাদেরকে ছড়ি দিয়ে প্রহার করে এসম্বন্ধে সাবধান করে। সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় প্লেটো আদর্শবাদ ছেড়ে বাস্তবে আসতেন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের প্রথম আইন হওয়া উচিৎ এই যে প্রতিবেশীর জমির সঙ্গে নিজের জমির সীমানা-চিহ্নে কেউ হাত দিতে পারবে না, ঐ সীমানা-চিহ্নের কোন অদল-বদল করা চলবে না। ঐ সীমানা-চিহ্নের পাথরটিকে যথাস্থানে রাখার শপথ নিয়েছে প্রত্যেকে, তার যেন নড়চড় না হয়" (আইন, ৮)। দোষী ব্যক্তির শিরে অভিশাপ বর্ষণ করত এট্রুস্কানরা : "এই সীমানা-চিহ্নকে যে স্পর্শ করেছে বা সরিয়েছে, তাকে শাস্তি দেবেন দেবতারা ; তার বাড়ি নিশ্চিহ্ন হবে ; সে নির্বংশ হবে ; তার জমিতে আর' ফল-ফসল হবে না ; শিলাবৃষ্টি, ছাতা-পড়া এবং ভ্যাপ্সা গরমে তার ফসল নষ্ট হবে ; হাত-পায়ে ঘা হবে, পচে যাবে।"[১] আদিম মানুষের বন্য ও উদ্দাম কল্পনার জগতে গভীর ছাপ ফেলেছিল ঈশ্বরদত্ত শাস্তি, কিন্তু তা ক্রমশঃ অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হতে লাগল। তখন কঠোর শারীরিক শাস্তি দেওয়ার দরকার দেখা দিল যা বর্বর মানুষদের উপলব্ধির ঠিক

১। ফাস্তেল দ্য কুলঁ্যাগেস এই পূত-পবিত্র বিধির কথা উল্লেখ করেছেন। Cite Antique.

বিপরীত। অবিরাম সংগ্রাম মুখর এক জীবন গড়ে তোলার কারণে বন্য মানুষরা নির্মমতম অত্যাচারের বোঝা আরোপ করত নিজেদের ওপর, কিন্তু এইসব অত্যাচার কখনোই শাস্তিমূলক নয়। সুসভ্য মালিকদলই বাইবেলের bene amat, bene castigat উদ্ভাবন করেছে। আমেরিকার বন্য মানুষদের খুব ভালভাবে চিনতেন ক্যাট্‌লিন। একবার এক সিউক্স প্রধান তাঁর কাছে খুব অবাক হয়ে বলে, যে সে দেখেছে "সীমানার ওদিকে সাদা লোকগুলো নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চাকে বেত দিয়ে চাবকায়। দয়া মায়া বলে তো ওদের কিছুই নেই!"
নিজের গোষ্ঠীর কারুর রক্তপাত করা বর্বরদের কাছে জঘন্যতম অপরাধ। নিজের গোষ্ঠীর কাউকে সে হত্যা করলে গোটা গোষ্ঠী তার প্রতিশোধ নেয়। গোষ্ঠীর কোন সদস্য খুন বা অন্য কোনও অপরাধ করলে তাকে বহিষ্কার করা হয় এবং তাকে উৎসর্গ করা হয় নরকের দেবতাদের কাছে—অর্থাৎ, ঐ হত্যাকারীকে খুন করে কেউ যেন আবার নিজের গোষ্ঠীর রক্ত না ঝরায়। তারপর আসে সম্পত্তি। সম্পত্তিই বর্বর মানুষকে এইসব শুভ অনুভূতিকে দু'পায়ে দলে-পিষে শেষ করে দিতে শেখায়। তৈরী হয় আইন—সম্পত্তির ওপর যারা আক্রমণ চালাবে, তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌-এর আইনে বলা হয়েছে, "চাষের উৎপন্ন ফসল যদি কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে কেটে নিয়ে যায় বা ঐ ক্ষেতে পশু চরাতে যায়, এবং যদি সে যৌবনে পৌঁছে থাকে, তাহলে তাকে দেবী সেরাস-এর (কৃষি ও শস্যের দেবী) কাছে উৎসর্গ করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যদি সে যৌবনে পৌঁছে না থাকে, তাহলে বিচারকের ইচ্ছানুসারে তাকে বেত দিয়ে প্রহার করা হবে, এবং যে ক্ষতি সে করেছে, তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান চোরটি (হাতে-নাতে যে ধরা পড়েছে) যদি স্বাধীন মানুষ হয়, তাহলে তাকে বেত দিয়ে প্রহার করা হবে এবং দাসে পরিণত করা হবে। শস্যের গাদায় কেউ আগুন লাগালে তাকে চাবুক মারা হবে এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে" (টেব্‌ল্‌ VIII, অধ্যায় ৯, ১০, ১৪)। চোরকে মৃত্যুদণ্ড দিত স্যাক্সনরা। রোমান আইনের থেকে বার্গাণ্ডিয়ান আইন ছিল আরও নির্মম। যে লোক কোন ঘোড়া বা ষাঁড় চুরি করেছে, যদি তার স্ত্রীরা ও ১৪ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা তাকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত না করত তাহলে তাদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান ছিল এই আইনে (৪৭, অধ্যায় ১, ২)। সম্পত্তি পরিবারের মধ্যে ইতর চরের সৃষ্টি করছে।
সাম্যবাদী গণগুলির (tribe) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে সম্পত্তির যৌথ রূপ যে সমস্যার মুখোমুখী হয়েছিল, তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব নৈতিক ও

দৈহিক শাস্তিগুলির মধ্যে; পৃথিবীর সকল দেশেই এইসব শাস্তির দেখা মেলে, এবং সর্বত্রই এগুলি একই রকম ভয়ঙ্কর।[১]

যৌথ সম্পত্তি চালু হওয়ার আগে বর্বররা তাদের গণের (tribe) সমস্ত সম্পত্তিকে নিজের বলেই মনে করত, আর সেইভাবেই কাজ করত। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে কোনরকম ভদ্রতার ধার না ধেরেই যে কোন বসতবাড়িতে প্রবেশ করার, এবং প্রয়োজনমত খাদ্য নেওয়ার অধিকার ছিল ল্যাসিডিমোনিয়ানদের। ল্যাসিডিমোনিয়ানরা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল—সত্য। কিন্তু সহজাত যুদ্ধপ্রিয়তার ফলেই তারা নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতিকে বজায় রাখতে পেরেছিল। যে কোন জিনিসকে নিজের করে পাওয়ার প্রবণতা ছিল বর্বরদের। যে সব ভ্রমণকারী তাদের এই প্রবণতার শিকার হয়েছেন, তাঁরা তাদেরকে চোর আখ্যা দিয়েছেন। যেন যে সমাজে তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি, সে সমাজের পক্ষে চুরিটা বেশ সুসঙ্গত ব্যাপার! মানুষ যা দেখত তা পেতে চাইতো, নিজের অধিকারে আনতে চাওয়াই ছিল তার স্বাভাবিক অভ্যাস। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদয় হওয়ারপর এই স্বাভাবিকতা আর বজায় রইল না। তখন থেকে কোন পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অন্য কেউ হাত দিলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হতে লাগল। এই বদ্ধমূল অভ্যাসের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য নৈতিক ও শারীরিক কঠোর দণ্ডদানের আশ্রয় নিতে হল। যৌথ সম্পত্তির পিছু পিছু হাজির হল বিচার, আর আমাদের এই জঘন্য দণ্ডবিধি। যৌথ সম্পত্তিই (Collective Property) এগুলির জন্মদাতা।

একমাত্র কারণ না হলেও, পিতৃতন্ত্র কর্তৃক মাতৃতন্ত্রের স্থান দখল করার পিছনে সর্বত্রই যৌথ সম্পত্তিই ছিল প্রধান কারণ। সম্পত্তির যৌথ রূপের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যৌথ সম্পত্তিই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের টিকে থাকার আবশ্যিক শর্ত এবং এই যৌথ সম্পত্তিতে ভাঙন দেখা দিলেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারও ভাঙতে শুরু করে, আর তার জায়গায় মাথা তোলে আধুনিক পরিবার। কালের গতিতে শীঘ্রই মুছে যেতে শুরু করে অনেককাল পূর্বের এক দুঃখময় স্মৃতিচিহ্ন। প্রাচীন সমাজ বুঝেছিল—পরিবারের

১। সম্পত্তি সর্বদাই ভয়ঙ্কর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত চোরদের অত্যাচার করার পর ফাঁসী দেওয়া হত। যারা নোট জাল করে, সভ্য ইওরোপে তাদেরকে আগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, আর এখনও তাদেরকে যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ভরন-পোষনের জন্য যৌথ সম্পত্তির বাঁধন অটুট রাখা একান্ত দরকার। এথেন্সে রাষ্ট্রই নজর রাখত যে যৌথ সম্পত্তি ঠিকভাবে চলছে কি না। জিনিস-পত্র নিয়ে পরিবার প্রধান কোন অন্যায় কাজ করলে যে কেউ তার কৈফিয়ৎ চাইতে পারত। পিতা বা পরিবারের কোন সদস্যই যৌথ সম্পত্তির মালিক নয়, তার মালিক হচ্ছে পরিবার, এক যৌথ সত্বা, যা চিরন্তন, বা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে।[১] অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্বদাই সম্পত্তি পরিবারের অধিকার-ভুক্ত। এই সম্পত্তি ছিল পূর্বপুরুষদের, আর এরই মাঝে রয়ে গেছে তাদের পূজার বেদী, সমাধিস্তম্ভ। এই সম্পত্তি এখনকার প্রজন্মের। এরা শুধু সম্পত্তির উপসত্ব ভোগ করে। পারিবারিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করাই এদের দায়িত্ব। সম্পত্তির পরিচালনভার থাকে পরিবার-প্রধানের ওপর। এই পরিবার-প্রধান পিতা হতে পারেন, অথবা বড় ভাই, ছোট ভাই, বা কখনো-সখনো মা। পরিবারের সকলের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখা, জমিতে ঠিকভাবে চাষ হচ্ছে কিনা দেখা, বাড়ির দেখ্‌ভাল করা—এসব তাঁরই দায়িত্ব। উদ্দেশ্যটা হল—নিজের পূর্বসূরীর মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, সেই অবস্থাতেই তা উত্তরসূরীর হাতে সঁপে দেওয়া। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পরিবার প্রধানের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকত। তিনিই বিচারক, তিনিই শাস্তিদাতা। নিজের পরিবারের সদস্যদের বিচার করার, দণ্ড দেওয়ার, শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অধিকারী তিনি। তাঁর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত যে তিনি ইচ্ছা করলে নিজের সন্তানদের দাস হিসাবে বিক্রি করে দিতে পারেন, পরিবারের যে কোন সদস্যকে দিতে পারেন মৃত্যুদণ্ড, এমনকি নিজের স্ত্রীকেও। যদিও এটা সত্য যে তাঁর স্ত্রীকে তার নিজের পরিবার এক অত্যন্ত অনিশ্চিত নিরাপত্তা দিতো। সাধারণত জমির বণ্টন করা হত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সংখ্যার অনুপাতে। চাষের কাজ করার জন্য ভৃত্য যোগাড় করার কথা মাথায় রেখে পিতা তার ছেলেদের শৈশবাবস্থাতেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন, যারা তাঁর উপপত্নী হিসাবে ব্যবহৃত হতো। হাক্স্‌টহউসেন বলেছেন—রাশিয়ায় দীর্ঘদেহী ও

১। জার্মান ও ব্যাভেরিয়ানদের মধ্যে নির্দিষ্ট বংশের অধিকারভুক্ত (genealogiae) সম্পত্তির নাম অনুসারেই তারা পরিচিত হত। রিপুয়ারিয়ান ফ্রাঙ্কদের মধ্যে তারা পরিচিত হত terrae aviaticae-র নামে। অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মধ্যে ethel বা alod parentum-এর নামে।

শক্তসমর্থ যুবতীরা তাদের ছোট্ট স্বামীকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

"পরিবারই হচ্ছে রাষ্ট্রের স্তম্ভ"—কথাটা বহু-ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। কথাটা আজ আর পুরোপুরি সঠিক নয়, তবু আধুনিক নীতিবাগীশ আর রাজনীতিকরা কথাটাকে বিরক্তিকরভাবে পুনরাবৃত্তি করে চলেন। কিন্তু এক সময় এ কথাটা একান্তই সত্য ছিল। যৌথসম্পত্তিবিশিষ্ট প্রতিটি গ্রামই এক একটি ছোট রাষ্ট্র। পরিবার-প্রধানদের আলোচনা-সভায় নির্বাচিত পরিষদই সেখানকার সরকার। এই পরিবার-প্রধানদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা একইরকম। ভারতবর্ষে সম্পত্তির এই যৌথ রূপের প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। সেখানে কারিগর (কুমোর, দর্জি, তাঁতি প্রভৃতি), স্কুলশিক্ষক, পুরোহিত এবং সার্বজনীন উৎসবের নাচনী মেয়েদেরকে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হত। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই তাদের বেতন দিতো। নিজেদের কাজের জন্য তারা দায়ী থাকত তাদের কাছে, যারা পরম্পরাক্রমে জমির ভাগ পেয়ে এসেছে। কিন্তু বহিরাগত বাসিন্দাদের কাছে তাদের কোন দায় ছিল না। গ্রীসের প্রজাতন্ত্রগুলিতে অভিজাত পরিবার-গুলির পুরুষ সদস্যদের জন্য রাষ্ট্র সার্বজনীন গণিকা পুষতো। স্যার জি, ক্যাম্পবেল অনেক বিচিত্র তথ্যের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটা বিচিত্র তথ্য হল—ভারতবর্ষের গ্রামে কারিগররা সাধারণত পুরোহিতদের থেকে বেশি পারিশ্রমিক পেতো।

হিসাবরক্ষক এবং গণনাকারী হিসাবে দক্ষতা, শিক্ষা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হয়। ঐ জনগোষ্ঠীর সম্পত্তির পরিচালক সে-ই। বাইরের সঙ্গে বাণিজ্য করার অধিকার একমাত্র তারই, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শস্য ও গবাদি পশু বেচার এবং নিজেদের গ্রামে যে সব জিনিস তৈরী হয় না, তা কেনার। হাক্স্টহাউসেন লিখেছেন: "শুধু পাইকারী বাণিজ্যই এখানে চালু থাকে। কৃষকের পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক। কারণ একা পড়ে গেলে অনেক সময়ই তাকে অসুবিধা-জনক সময়ে প্রকৃত মূল্যের থেকে কম দামেই নিজের জিনিস বেচে দিতে হবে। কিন্তু বাণিজ্যের দায়িত্ব থাকে প্রধানের হাতে। আশপাশের গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে। ফলে, মূল্য বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করা ও জিনিস বিক্রি করার আগে সমস্তরকম অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয় তার পক্ষে।" বণিকরা যেভাবে কৃষকদের প্রবঞ্চনা করে থাকে তার সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা প্রত্যেকেই হাক্স্টহাউসেনের এই কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করবেন। ঠিক কোন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই ফরাসী বুর্জোয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আলজিয়ার্স ও টিউনিস্-এর ওপর। আক্রমণের পরে

তারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেনি, সবকিছুই করতে হয়েছে গোষ্ঠীর প্রধানদের মাধ্যমে—এর জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঐ বুর্জোয়ারা। খুব জোরে-জোরে, সহানুভূতিভরা গলায় তারা বলেছিল—আহা, কী হতভাগ্য এই আরবরা! ইউরোপীয় বণিকদের হাতে লুঠ হওয়ার জন্য নিজেদেরকে তুলে দেওয়ার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত নেই এদের!

যৌথ সম্পত্তির (collective property) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ছোট ছোট সমাজ এমন এক জীবনীশক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বহন করে যা অন্য কোন রূপে গঠিত সমাজের পক্ষে একই মাত্রায় বহন করা সম্ভবপর নয়।

লর্ড মেট্‌কাফ্‌ বলেছেন, "ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলি একেকটি ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র। প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই তাদের হাতে আছে, কোন বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর তারা নির্ভর করে না। যেখানে আর কিছুই টিকতে পারে না, সেখানেও তারা টিকে থাকে। একের পর এক রাজবংশের পতন হয়, ঘটে যায় বিপ্লবের পর বিপ্লব। ঘুরে ফিরে রাজত্ব করে হিন্দুরা, অন্যান্য পৌত্তলিকরা (pagan), মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজরা। কিন্তু ঐ সব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কোন পরিবর্তন হয় না। বিপদের সময় তারা অস্ত্র তুলে নেয়, নিজেদেরকে নিরাপত্তাকে সংহত করে। দেশের মধ্যে দিয়ে হয়ত কোন শত্রুবাহিনী যাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলি তখন নিজেদের সব গরু-ছাগল তুলে নেয় গ্রামের পাঁচিলের মধ্যে, শত্রুকে চলে যেতে দেয় নিরুদ্বেগে। তাদের ওপর যদি লুঠপাঠ চলে, ভাঙ-চুর করা হয় আর আক্রমণকারীরা যদি অপ্রতিরোধ্য হয়, তাহলে তারা কিছুদূরের কোন মিত্রভাবাপন্ন গ্রামে পালিয়ে যায়। তারপর হানাদাররা চলে গেলে তারা ফিরে আসে, যে যার কাজ শুরু করে। কোন জায়গায় যদি কয়েক বছর ধরে লুঠপাট, খুন-খারাবি চলে, তাহলে সেখানে আর মানুষ থাকতে পারে না। গ্রামবাসীরা তাদের বাসস্থানছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থা সৃষ্টি হলেই তারা আবার ফিরে আসে। হয়ত এর মধ্যে একটা প্রজন্ম কেটে যায়, কিন্তু পরের প্রজন্ম ঠিক ফিরে আসে সেখানে। পিতার জায়গা নেয় পুত্ররা। গ্রামের সেই একই জায়গা, একই বাড়ি, একই জমির দখল নেয় উত্তরসূরীরা…। কোন ছোটখাট ব্যাপার তাদেরকে গ্রামছাড়া করতে পারে না, কারণ অনেক সঙ্কট, অনেক আলোড়নের মধ্যেও তারা নিজেদের জায়গায় অটল থাকে, এই লুঠ-পাট ও অত্যাচারকে প্রতিহত করার মত শক্তিও বাঁধন আছে তাদের।"

তিনি আরও বলেছেন: "গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বাইরের যে কোন আঘাত সামলে দিতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান আইন-কানুন ও

আদালতের দৌলতে কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে ঐসব জনগোষ্ঠী খুব সহজেই ভেঙে পড়বে। একে ধ্বংস করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে আধুনিক মামলা মকদ্দমাঘটিত জটিলতা।"[১]

১। হাউস অভ কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন, ১৮৩২, লর্ড মেট্‌কাফের উল্লেখযোগ্য জবানবন্দীটি XI-শ খণ্ডের পরিশিষ্টে বিস্তৃতভাবে মুদ্রিত হয়েছে। আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকরা সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বারবার আলোচনা করেছেন। আর এই সব সীমাহীন আলোচনা বারবারই ফিরে এসেছে সেই সূচনা বিন্দুতে, অর্থাৎ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলপ্রয়োগের সাহায্যে, কিন্তু সময়—যে সব কিছুকেই পরিবর্তিত করে—সম্পত্তির গায়ে এঁকে দিয়েছে করুণা আর পবিত্রতার ছাপ। কিছুদিন আগে আগে পর্যন্ত মানব সমাজের দর্শনতত্ত্বের লেখকরা যৌথ সম্পত্তির (collective property) অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। ব্যারণ হাক্‌স্টহউসেন ১৮৪০ সালে রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। তিনি যৌথ সম্পত্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং তার বিবরণ লিপি-বদ্ধ করেন "Etudes sur la situation interieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie", রচনায়। তিনি বলেছিলেন যে 'মির' ছিল সেইসময়ে জনপ্রিয় স্যাঁ সিমোর ইউটোপীয় মতবাদেরই বাস্তব রূপ। বাকেনাইন্‌ ও উদারপন্থী রাশিয়ানরা এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ায় যৌথ সম্পত্তির অস্তিত্বের কথা ভাবেন নি। এবার তাঁরা হাক্‌স্টহউসেনের আবিস্কারকে পুনরাবিস্কার করলেন। নিজেদের অনির্দিষ্ট নৈরাজ্যবাদ সত্ত্বেও তারা হচ্ছেন রাশিয়ান দেশপ্রেমিক, তারা মনে করেন যে স্লাভ্‌ জাতির উদ্ভব হয়েছে মানবসমাজকে পথ দেখানোর জন্যই। আর তাই তারা সম্পত্তির ঐ আদিম ও জীর্ণ রূপটিকে, অর্থাৎ 'মির'-কে, সম্পত্তির ভবিষৎ রূপ হিসাবে ঘোষণা করে। দরকার শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলির নিজেদের সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে রাশিয়ান কৃষকদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

একেবারে চোখের সামনের জিনিস দেখতে পাওয়াই তত্ত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে কঠিন। তাই দেখি হাক্‌স্টহউসেন রাশিয়ায় 'মির' আবিস্কার করেছেন, কিন্তু জার্মানীতে অসংখ্য পরিমানে ছড়িয়ে থাকা 'মার্ক'-এর অস্তিত্ব ও চিহ্নগুলি তিনি খুঁজে পাননি। তিনি বলেছিলেন—যৌথ সম্পত্তি স্লাভ্‌সমাজের বৈশিষ্ট্য। মরার (Maurer) দেখিয়েছিলেন যে জার্মান সমাজও যৌথসম্পত্তির স্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। মরার-এর পর থেকে পৃথিবীর সব দেশে, সব জাতির মধ্যে যৌথ

বুর্জোয়া শোষণ কখনও নিজের পাশাপাশি সম্পত্তির যৌথরূপকে বরদাস্ত করে না। যৌথ সম্পত্তিকে সে ধ্বংস করে, আর তার জায়গায় আমদানী করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা বুর্জোয়া সম্পত্তির পূর্ণতর রূপ। ভারত ও আলজিরিয়াতে যা ঘটেছে, তা-ই ঘটেছিল ফ্রান্সেও। যে গ্রামীণ-যৌথগুলি সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক যুগব্যাপী টিকে ছিল, বিদ্যমান ছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বুর্জোয়া বিপ্লব সঙ্ঘটিত হবার সময় ও তার পরবর্তীকালে আইনের ভাঙনমূলক কার্যকলাপ সেগুলিকে ধ্বংস করে। মহান বিপ্লবী আইনজ্ঞ মার্লিন 'সাসপেক্ট' (রক্তলোলুপ loi des suspects বা সন্দেহের আইনের তিনিই প্রবক্তা, তাই তাঁকে ঐভাবে ডাকা হত) গ্রামীণ-যৌথগুলি ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে এবং তাদের সার্বজনীন জমিকে বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন ; শত শত বছর ধরে সামন্ত প্রভুরাও এতটা করে উঠতে পারেনি।

রাজনীতিক চরিত্রগত কারণগুলি রাজতান্ত্রিক সরকার গুলিকে যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারিবারিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে উৎসাহ যোগায়। এইসব রাজনীতিক কারণ ছাড়াও আছে একইরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কারণ-সমূহ। যৌথতাবাদী গ্রামগুলিকে (Collective village) নিয়ে কিছু প্রশাসনিক একক (unit) গড়ে ওঠে। গ্রামের প্রধানরাই এইসব এককের প্রতিনিধি। তারাই একে পরিচালনা করে, এর হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। কাজেই, সরকার থেকে এই প্রধানদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয় কর সংগ্রহ করার, সৈন্যবাহিনীর জন্য সৈনিক সংগ্রহ করার। এছাড়াও তাদের ওপর আরও কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়ে থাকে, যেগুলির জন্য তারা কোন পারিশ্রমিক পায় না। রাশিয়ায় সাম্রাজ্যিক সরকার গোষ্ঠীপরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রচুর গুরুত্ব দিত। বৃদ্ধ প্রধানেরা যাদের আচার-আচরণকে অনুমোদন করতেন না, তাদেরকে সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে নেওয়া হত, এমনকি সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত

সম্পত্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। হাকস্টহউসেনের আগে ভারতবর্ষের ইংরেজ কর্মচারীরা অবশ্য তাঁদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে সম্পত্তির এই নির্দিষ্ট রূপটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কার চাপা পড়ে গিয়েছিল সরকারি রিপোর্টের স্তুপে, বিদ্বজ্জনসমক্ষে তা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এই প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আসার পর থেকে দেখা গেছে যে গত শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর সূচনায় অনেক লেখকই এই নির্দিষ্ট রূপটিকে বহু জায়গায় চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের ল্য গ্রাঁদ দ্যসি, ফ্রাঁসোয়া দ্য নফশ্যাতু এবং ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ মার্শাল।

ফরাসী রাজতন্ত্র কৃষকদের এই যৌথতাবাদী সংগঠনগুলিকে সমর্থন করত। কিন্তু এই সংগঠনগুলিকে একদিক থেকে যেমন সামন্ত প্রভুরা আক্রমণ করত, নির্মম-ভাবে তারা কেড়ে নিতো কৃষকদের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি ও সুযোগ-সুবিধাগুলি এবং অন্য দিক থেকে তেমনই আক্রমণ করত বুর্জোয়ারা, যেন-তেন-প্রকারেণ তারা কেড়ে নিত কৃষকদের জমিজমা।[১]

কৃষকদের সংগঠনকে পারিবারিক যৌথ করে তোলার জন্য উৎসাহ দিত সামন্ত-প্রভুরা। ১৭-শ শতাব্দীতে একটা চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন দালোজ্। এই চুক্তি অনুযায়ী সামন্ত প্রভু তার জমি চাষ করার অধিকার দিচ্ছে মেতায়েরুদের। সেইসঙ্গে শর্ত করছে—কৃষকদের একসঙ্গে মিলে-মিশে খাওয়া দাওয়া ও থাকতে হবে, চিরস্থায়ী গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। ১৮-শ শতাব্দীর আইনজ্ঞ দুনোদ্ কৃষকদের গোষ্ঠী গড়ে ওঠার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "আলাদা আলাদাবাড়িতে না থেকে একসঙ্গে থাকলে কৃষকেরা সামন্ত-প্রভুর জমিতে আরও ভাল-ভাবে চাষ করতে পারে এবং ঐ প্রভুটিকে ঠিকমতো কর দিতে তাদের সুবিধা হয়।"

১। রাশিয়ার বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা 'মির'-এর ওপর আস্থা স্থাপন করে। 'মির'-কে টিকিয়ে রাখতে চায় তারা। তাদের মতে—যৌথভাবে বেঁচে-থাকা একটি কৃষক-শ্রেণীর অস্তিত্ব ভূমিগত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করবে। যৌথ সম্পত্তি যে সাম্যবাদী মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, তাকে বিচার-বিবেচনা করে সমাজতান্ত্রিক সরকার জমি আর তার সমাজবদ্ধ চাষকে জাতীয়করণ করার অনুকূল পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এই ধরণের সম্পত্তি বজায় থাকাকালীন রাশিয়ায় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অসম্ভব। 'মির'-এর ভিত্তিতে সংগঠিত প্রতিটি গ্রাম-যৌথই স্বাধীন। তারা আত্মনির্ভর, একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে তাদের যে কোন বিরুদ্ধ প্রবণতাকেই যে কোন সরকারের পক্ষে কণ্ঠরোধ করা খুবই সহজ। ঠিক এটাই ঘটেছে ভারতবর্ষে। ইংরেজ সরকারের হাতে রয়েছে ৫০ হাজার ইওরোপীয় সৈন্য, আর তাদের অধীনে রয়েছে রাশিয়ার মত ঘন বসতিপূর্ণ এক সাম্রাজ্য। কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনে গ্রাম-যৌথগুলি ঐক্যবদ্ধ নয়, ফলে কোন দারুন প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও তারা অক্ষম। জোর দিয়েই বলা যায় যে সরকারী স্বেচ্ছাচারীতার নিশ্চিততম ভিত্তি হচ্ছে যৌথ সম্পত্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সংগঠন।

আদিম গোষ্ঠীগত সাম্যবাদকে ধ্বংস করে যৌথ সম্পত্তি (Collective property) পারিবারিক সাম্যবাদ (Family communism) প্রতিষ্ঠা করল। এই সাম্যবাদ তার প্রতিটি সদস্যকে অভাব থেকে মুক্তি দিল। হাক্সটহউসেন লিখেছেন, "রাশিয়ায় কোন সর্বহারা নেই, আর যতদিন এই প্রতিষ্ঠান (mir) টিকে থাকবে, ততদিন তাদের দেখা মিলবেও না। কোনলোক দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, নিজের ধনসম্পত্তির অপব্যয় করতে পারে। কিন্তু পিতার ভুলত্রুটি বা দুর্ভাগ্য কখনোই তার সন্তানদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। কারণ তাদের অধিকার গোষ্ঠীগত, আপন পরিবারে নয়, এবং তারা তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও নয়।"
অভাবের বিরুদ্ধে এই যে নিরাপত্তা যোগায় যৌথ সম্পত্তি, সেটাই পুঁজিপতিদের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ পুঁজিপতিদের যাবতীয় সৌভাগ্য নির্ভর করে শ্রমিক-শ্রেণীর দুর্দশার ওপর।
যৌথ সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক যৌথগুলিকে দৃঢ় করে তোলে, মজবুত করে তোলে, কৃষকদের মঙ্গল করে, কিন্তু শুধু এটুকুই যৌথ সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য নয়। নিজের কীর্তিগুলির চমৎকারীত্বের জন্যও সে বিশিষ্ট। যেমন, ভারতবর্ষে সেচ সংক্রান্ত বিস্ময়কর কাজগুলি, জাভায় পাহাড়ী ঢালের চত্বর জোড়া চাষবাস। ওয়ালেস্ বলেছেন যে এই চাষ হত শত শত বর্গমাইল এলাকা জুড়ে; "জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছর এই চত্বরও বেড়ে যায়, নিজ নিজ গ্রাম-প্রধানের নির্দেশমত প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে কাজ করে। আর সম্ভবত গ্রামীণ চাষের এই ব্যবস্থার ফলেই অত ব্যাপক চত্বর বানানো আর সেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে।"[১]
যেখানেই গবেষণা চালানো হয়েছে, সেখানেই যৌথ সম্পত্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। নির্দিষ্ট কোন দেশের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক বিকাশ অনুযায়ী যৌথ সম্পত্তি কোথাও স্বল্পস্থায়ী হয়েছে, কোথাও বা টিকে থেকেছে দীর্ঘদিন। গণের (tribe) সার্বজনীন সম্পত্তির ভাঙনের ফলেই গড়ে উঠেছিল যৌথ সম্পত্তি। আবার পিতৃতান্ত্রিক একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির এই রূপটিও ধ্বসে পড়ল। তার জায়গায় গড়ে উঠল ভেঙে যাওয়া পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে যৌথ সম্পত্তির গর্ভ থেকেই জন্ম হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির। দেওয়াল ও বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ি ও বাগান ছিল পরিবারের একান্ত নিজস্ব ও অ-হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি। কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের, এমনকি দাসদেরও কিছু

১। এ. আর. ওয়ালেস, "দ্য মালয় আর্কিপেল্যাগো", ১৮৬৯, খণ্ড ১.

peculium অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতো, যাতে ঐ পরিবারের অন্যসদস্যদের কোন অধিকার থাকতো না। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি তার মালিকরা নিজস্ব শ্রমের দ্বারা অর্জন করত, এবং প্রায়শই এটা বেশ ভালরকম কিছুই হত—দাস, গরু-ছাগল ও নানান ধরণের অস্থাবর সম্পত্তি। এই একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বোধ ধীরে ধীরে অর্জিত হয়েছে। একেবারে প্রথম দিকে পরিবারের সদস্যদের কারোরই ব্যক্তিগত বলে কিছুমাত্র জিনিস থাকতো না। যা কিছু সে অর্জন করত, তা গোষ্ঠীর সকলের অধিকারভুক্ত হত।

যে সব কর্ষণযোগ্য জমি ও পশুচারণভূমি পরিবার ভোগ করত, সেগুলিই শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। একসময় এই পরিবার যখন খণ্ডিত হল অর্থাৎ প্রত্যিটি পুরুষ বিয়ে করে পারিবারিক যৌথ আবাস ছেড়ে তার নিজস্ব বাড়িতে চলে গেল তখনই স্থাবর সম্পত্তি পরিণত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। স্থাবর সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হল সন্তানদের মধ্যে. তা হয়ে উঠল একএকজনের নিজস্ব সম্পত্তি।

যৌথ রূপ থেকে সম্পত্তির ব্যক্তিগত রূপে এই বিবর্তন ঘটেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। এতই ধীর, যে কোন রকম বাহ্যিক উদ্দীপনা না পেলে বহুদেশে যৌথ সম্পত্তি কোনরকম পরিবর্তন ছাড়াই আরও শত শত বছর টিকে থাকতে পারতো। যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গ্রামগুলি ছিল এক একটি আর্থনীতিক একক (economic units)। অর্থাৎ, নিজের বাসিন্দাদের মননগত ও বস্তুগত চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু উপাদানই থাকতো ঐ গ্রামগুলিতে, পক্ষান্তরে, কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানোর মত উপাদান খুব কমই থাকতো ঐ সব গ্রামে। এখানে সব কাজই সম্পাদন করা হত বর্ষীয়ানদের বলে-দেওয়া প্রথা অনুসারে। মহামূল্য সম্পদের মতই সেগুলি এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে বর্তাতো। কার্যতঃ, কোন গ্রাম যখন শিল্প ও কৃষিগত বিকাশের এমন স্তরে পৌছায়, যখন সে তার বাসিন্দাদের স্বাভাবিক ও সাধারণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম, তখন সে তার নিজের মধ্যে পরিবর্তনের আর কোনও কারণ খুঁজে পায় না। তাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য তখন বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রয়োজন।

কৃষিই ছিল সার্বজনীন গোষ্ঠীগত সম্পত্তির (common tripal property) বিভাজনের সুনির্দিষ্ট কারণ। আবার, এই কৃষিই ছিল যৌথ সম্পত্তির ভাঙনের অন্যতম কারণ। কৃষি কাজে উন্নত পদ্ধতি যত বেশি করে চালু হতে লাগল, ততই কৃষকরা বুঝতে শিখল যে তাদের অংশের জমিতে যে সার ও শ্রম নিয়োজিত হয়েছে, তার লাভ তোলার জন্য বছরের হিসাবে জমির পাট্টা

পাওয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। এতকাল পর্যন্ত জমির পাট্টা বিলি করা হত এক বছরের হিসাবে। এবার তারা দাবী করল—জমির পাট্টা দুই, তিন, সাত বা এমনকি বিশ বছরের মেয়াদে দিতে হবে। রাশিয়াতে সরকার বাধ্য ছিল লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী জমি ভাগ করে বিলি করতে। কৃষকরা একে বলত 'কালো' অর্থাৎ খারাপ ভাগাভাগি। এ থেকে বোঝা যায় যে যেসব পরিবার মনে করত বিগত বণ্টনে তাদেরকে যে জমিটা দেওয়া হয়েছিল তার ওপর তাদের মালিকানা সত্ব রয়েছে, তাদের পক্ষে এই রকম ভাগাভাগিটা অত্যন্ত অবিচারের সামিল ছিল। তাই উন্নত পদ্ধতি প্রথমে কাজে লাগানো হল কর্ষণযোগ্য জমিতে, আর শেষ পর্যন্ত এইসব জমি অ-হস্তান্তরযোগ্য হয়ে উঠল। পশুচারণভূমির ক্ষেত্রে কিন্তু এক বছরের মেয়াদে পাট্টা বিলি করা চলতেই লাগল। কর্ষণযোগ্য জমি যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সার্বজনীন জমিতে লাগানো গাছগুলি তারাই ভোগ করত, যারা ওগুলিকে ওখানে লাগিয়েছে। এমনকি যে সব জমি কিছুদিন অন্তর অন্তর বিলি ব্যবস্থা হয়. সে সব জমির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল।

যে সব গ্রামে যৌথ সম্পত্তি চালু আছে, সেই সব গ্রামে প্রতিটি পরিবারের প্রধানই সমমর্যাদাসম্পন্ন। জমির বিলি ব্যবস্থায় সমান অধিকার থাকে তাদের প্রত্যেকের, কারণ তারা প্রত্যেকেই একই গোষ্ঠীর সন্তান। ধরা যাক, কারিগর, পলাতক বা যুদ্ধবন্দী হিসাবে কোন বিদেশী তাদের গ্রামে বসবাস করতে এল। গোষ্ঠীর প্রাচীন রীতিনীতি মেনে তাকে একদিন মুক্ত নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর সে গ্রামের আদি বাসিন্দাদের মতই জমির ভাগ পাওয়ার অধিকারী হয়। যতদিন পর্যন্ত গ্রামগুলি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং হাতের নাগালে মজুত থাকে প্রচুর পরিমাণে জমি, ততদিন পর্যন্তই এইভাবে বিদেশীদের গ্রহণ করা সম্ভব। একসময় এই জনবহুল গ্রামগুলি বাধ্য হল লোক-জনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে, নতুন উপনিবেশের খোঁজ করতে, এবং আশপাশের জঙ্গল কেটে সাফ করতে। নির্দিষ্ট একটা সীমারেখার বাইরে, এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন জমির বনজঙ্গল সাফ-সাফাই করে কৃষি জমিতে পরিবর্ত্তিত করার এবং ভোগ দখলের অধিকার ছিল প্রতিটি পরিবারের। কিন্তু সমুদ্রতীরের বা নদীর ধারের গ্রামগুলিতে এত বিপুল পরিমান অব্যবহৃত বা অকর্ষিত জমি থাকতো না, কারণ এইসব গ্রাম বেশ সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থিত বলে বিদেশীদের ভীড় এইসব গ্রামেই বেশি হত। এই গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট শহরে পরিণত হয়ে উঠলো এবং বিদেশীদের পক্ষে এখানে প্রবেশাধিকার

পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। সাময়িক বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্যও কর দিতে হত সেখানে।[১]

আঞ্চলিক ভূমি বণ্টনে কোন ভাগনবাগতদের দেওয়া হত না, পশুচারণ-ভূমিতে পশু চরানোর অধিকারও থাকতো না তাদের। ছিল না শহরের প্রশাসনে অংশ নেওয়ার অধিকারও। এইসব অধিকার ছিল শুধুমাত্র প্রাচীন পরিবারগুলির। এরা ছিল গোষ্ঠীর সুবিধাভোগী অংশ। এক ধরণের গোষ্ঠীগত অভিজাততন্ত্রতা, অর্থাৎ পৌর অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠত এদের নিয়ে। একদিকে এরা সামন্ততান্ত্রিক বা যুদ্ধবাজ অভিজাততন্ত্রের বিরোধিতা করত, আবার অন্যদিকে বিরোধিতা করত বিদেশী কারিগরদের। গোষ্ঠীগত অভিজাততন্ত্রের (Communal aristocracy) অবিরাম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই বিদেশী কারিগররা গড়ে তুলেছিল নিজেদের বাণিজ্য সংস্থা (trade corporation)। শহরের সদস্যদের মধ্যেকার এই বিভাজন গোটা মধ্যযুগে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হিসাবে সর্বক্ষণ কাজ করেছে।

প্রাচীন পরিবারগুলির (primitive families) মধ্যেও দেখা দিল অসাম্য। কোন একটা পরিবার হয়ত অযৌক্তিক ভাবে কিছুটা জমি বেশি পেয়ে গেল, আর অন্যরা হয়ত ঋণ শোধের জন্য নিজেদের ভাগের জমিটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, ইত্যাদি। যৌথতাবাদী গ্রামগুলির (Collectivist village) বাসিন্দারা এতদিন অনুপ্রাণিত হত সমতার মনোভাবে। কিন্তু এইভাবে জমি আত্মসাৎ করার প্রবণতায় দরুণ ঐ সমতার মনোভাব ক্ষতিগ্রস্ত হল দারুণভাবে। জমির একচেটিয়া দখলদারদের মাথায় অভিশাপ বর্ষিত হত সর্বত্রই। রাশিয়ায় এদেরকে বলা হত গোষ্ঠী-খাদক (Community eaters)। জাভায় একপুরুষের বেশি উত্তরাধিকার

১। এম. রিভিয়ের তাঁর ১৮৫৬ সালের "Histoire des biens Communaux jusqu'an XIII, siecle" গ্রন্থে ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে—রাইম্ অঞ্চলে সাময়িক বসবাসের অধিকার পেতে হলে প্রত্যেক বিদেশীকে এক বুশেল জই এবং একটি মুরগী দিতে হবে আর্চ বিশপকে, আটটি ক্রাউন দিতে হবে মেয়রকে, আর চার ক্রাউন দিতে হবে অল্ডারম্যানদের। আর্চবিশপ হচ্ছেন সামন্ত প্রভু, তাঁকে প্রদেয় জিনিসগুলি তুলনামূলকভাবে মামুলী। মেয়র আর অল্ডারম্যানরা হচ্ছে গোষ্ঠীগত বা পৌর অভিজাততন্ত্রের প্রতিনিধি, এবং তাদেরকে যা দিতে হত, তা ঐ সময়ের পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল।

দাবী করা নিষিদ্ধ ছিল। ইসাইয়া ঘোষণা করেছিলেন: "যারা বাড়ির পর বাড়ি বানায়, দখল করে জমির পর জমি—তাদেরকে অভিশাপ দিই। আর কোন জায়গাই খালি রাখবে না তারা, পৃথিবীর বুকে যেন শুধু তারা ক'জনাই বসবাস করবে" (৮ম খণ্ড)।

কিন্তু গ্রাম-যৌথের (Village Collectivities) দুর্দশা ও ভাঙনের পিছনে সবথেকে শক্তিশালী যে সব কারণ কাজ করেছে, বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায় তার অন্যতম। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে এ ঘটনা দেখা গেছে।

একেবারে সূচনায় কর দেওয়া হত জিনিস-পত্রে, এবং উৎপন্ন ফসল পরিমাণের অনুপাতে। কিন্তু সরকার (government) ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠে এই ধরণের করদান তার দাবী আর মেটাতে পারল না। উৎপন্ন ফসলের অবস্থার কথা বিন্দুমাত্রও বিবেচনা না করে সে কর হিসাবে অগ্রিম অর্থ আদায় করতে শুরু করল। ফলস্বরূপ, গ্রামবাসীরা বাধ্য হল গ্রামের নোংরা-পোকা ঐ সব সুদখোর মহাজনের কাছে হাত পাততে। সরকারের আনুকূল্য-প্রাপ্ত এই জঘন্য জীবগুলি নির্লজ্জের মত রক্ত চুষতে কৃষকদের। কৃষিজীবিদের এরা পরিণত করে চিনির বলদে, যারা চাষ করে শুধু ঋন শোধ করার জন্যই। আর যতই শোধ করে, ততই বেড়ে যায় ঋন। সুদখোরদের প্রতি মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণা তাই এত ব্যাপক ও তীব্র। সেমিটিক্-জাতি বিরোধী প্রচারের ফলে রাশিয়ার গ্রামে এক রক্তঝরা পটভূমি তৈরী হয়েছিল। আসলে, কৃষকদের কাছে ইহুদী ও সুদখোরের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। আব্রাহামের বিশুদ্ধতম বংশধরদের মত নিখুঁতভাবে কৃষকদের বঞ্চনা করার চেষ্টা করত অনেক গোঁড়া খ্রীশ্চিয়ানও। সেমিটিক্-জাতি বিরোধী আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় এদের ওপরেও লুঠপাট চালানো হয়েছিল, ভাঙচুর করা হয়েছিল। জমি তখন ক্রমশই বেশি বেশি করে পৃথক পৃথক পরিবারের আওতায় আসছিল। সেই সব জমিকে একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করা এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে অন্যতম কারণ হলো শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এইসব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১ সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি

সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির দুটি রূপ। প্রথমটি হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি, যাকে ফরাসী সামন্তরা বলত শরীরী (Corporeal) সম্পত্তি। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে থাকে একটা দুর্গ বা প্রাসাদ, তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, আর একটা মোরগ যতদূর উড়তে পারে ততদূর পর্যন্ত চারপাশের জমি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অস্থাবর বা অ-শরীরী সম্পত্তি, যার মধ্যে পড়ে সামরিক কার্যকলাপ, সাহায্য, ত্রাণ, জরিমানা, খাজনা প্রভৃতি।

চার্চের সম্পত্তিও এক ধরণের সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিই। যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, এবং ঐসব জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেই সে বিকশিত হয়েছিল। রূপান্তরের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথ পার হয়ে সে পরিণত হয় বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সম্পত্তিতে। আর এই পুঁজিবাদী সম্পত্তিই হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চূড়ান্ত রূপ।

পরিবার থেকে, বা আরও যথাযথভাবে বললে, রক্তসম্বন্ধযুক্ত যৌথতা (Consanguine Collectivism) থেকে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে এসে পৌছনোর পথে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক সংগঠন একটি সেতু হিসাবে কাজ করেছে।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমিদারের নানান বাধ্যবাধকতা থাকে, সে পুঁজিপতির মত যথেচ্ছ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। অর্থাৎ, যে কোন জিনিসকে যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপব্যবহার করার স্বাধীনতা তার থাকে না। ভূমিকে বাজারে পণ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় না, নানান শর্তের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে জমি, আর তা হস্তান্তরিত হয় ঐতিহ্যগত প্রথা অনুসারে। জমির মালিকরা এইসব প্রথা লঙ্ঘন করার সাহস পায় না। ঐতিহ্যগতভাবে নিজের উর্দ্ধতন ও অধস্তনদের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে সে বাধ্য থাকে।

মর্মবস্তুর দিক থেকে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে নানান বিপরীতমুখী কাজ-কর্মের সম্মিলন। সামন্তপ্রভুর হাতে থাকে শুধু তার জমি, এবং নিজের প্রজাদের শ্রম ও ফসলের ওপর একটা দাবী। সেইসঙ্গেই পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে

উর্দ্ধতনদের মঙ্গলবিধান ও সেবা করতে হবে এবং নির্ভরশীলদের সাহায্য করতে হবে। প্রজারা শপথ নেয়—সামন্তপ্রভুর প্রতি তারা অনুগত থাকবে, শ্রদ্ধাশীল থাকবে। সামন্তপ্রভু তার আয়ত্তাধীন যাবতীয় উপায়ে প্রজাদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, এবং তার প্রতিদানে প্রজারা ঐ সামন্তপ্রভুর সামরিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াতে বাধ্য থাকে, এবং তাকে কিছু কিছু খাজনাও দেয়। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সামন্তপ্রভুটি আরও প্রতাপশালী কোন বড় সামন্তপ্রভুর অধীনতা স্বীকার করে, এবং এই শেষোক্ত সামন্তপ্রভুটি আবার হয়ত কোন রাজা বা সম্রাটের অধীনস্থ খাস সামন্ত।

ভূমিদাস থেকে শুরু করে রাজা বা সম্রাট পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রতিটি সদস্যই পরস্পরের প্রতি নানান কর্তব্য পালন করার বাঁধনে আবদ্ধ থাকত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রাণবস্তু ছিল এই কর্তব্যবোধ, যেমন আমাদের এই আধুনিক সমাজের প্রাণবস্তু হল অর্থলালসা। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের মনে প্রভাব ফেলার জন্যই সবকিছু করা হত সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। লোকায়ত কবিতা (Popular Poetry) হচ্ছে শিক্ষার সুপ্রাচীন ও প্রচণ্ড শক্তিশালী এক মাধ্যম। এই লোকায়ত কবিতা কর্তব্যকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করেছিল। সামন্তযুগের মহান বীর ছিলেন রলাঁ। রঁসভ্যালে-তে স্যারাসেনরা (মুসলিম বেদুইন) তাঁকে আক্রমণ করে এবং পরাজিত হন তিনি। শার্লম্যান তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আর সে ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অলিভার। তখন রলাঁ তাকে ভর্ৎসনা করেছেন এইভাবে :

> "অমন কঠিন কথা বোলো না কথনো।
> ধ্বংস হোক বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভীরুতা !
> আমরা থাকবো অটল-অচল এইখানে, এইখানে—
> রুখবো সাহসে তরবারি আর আঘাত, শত্রুহাতে।"

* * * * *

> "প্রভুর জন্য মাথায় পেতে নিতে হয় হাজারো যন্ত্রণা ,
> সহ্য করতে হয় প্রবল শৈত্য আর প্রচণ্ড উত্তাপ ;
> প্রভুরই জন্য দিয়ে যেতে হয় জীবন খানি নিজের !
> বর্শা ওঠাও, আমার হাতে এই ত্যাখো এই দুরেঁদাল্,
> ঝক্‌মকানো তরবারি এক—দিয়েছিলেন রাজা ;
> জীবন-প্রদীপ নিভলে আমাই এইখানা যে পাবে,
> হয়ত সে জন বলবে হেঁকে :

মহান প্রজার হাতেই ছিল এই সে তরবারি।"

—"রলাঁর গান"(Chanson de Roland),[১]

অধ্যায় xciii and xciv

রক্তসম্বন্ধযুক্ত যৌথতা গোষ্ঠীগত এককের জন্ম দিয়েছিল। কোন প্রদেশ বা রাষ্ট্রের স্বনির্ভর ও পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলিকে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাঁধনে বেঁধে সামন্ততন্ত্র এক প্রাদেশিক ও জাতীয় জীবন সৃষ্টি করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামন্ততন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন জমিদারীর এক যুক্তরাষ্ট্র।

নিজের ভূমিদাস, প্রজা ও পোষ্যদের প্রতি জমিদারকে নানান রকম গুরুভার কর্তব্য পালন করতে হত। কিন্তু সামন্ততন্ত্র যতই ক্ষইতে থাকে, ততই সে এই সব কর্তব্য পরিত্যাগ করতে শুরু করে। আবার সেইসঙ্গেই সে তার খাজনা ও বশ্যতা আদায় করেই চলে, এমনকি কখনও কখনও আগের থেকেও বেশি পরিমাণেই করে। আদতে কিন্তু এই খাজনা ও বশ্যতা ছিল তার কাজকর্মের প্রতিদান মাত্র। সামন্তপ্রভু হিসাবে নিজের দায়িত্ব অবহেলা করেই কিন্তু সে ক্ষান্ত হল না। প্রজাদের জমির ওপর এবং গোষ্ঠীগত এলাকা ও অরণ্যের ওপর

১ কোন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় গাওয়া হত এই রলাঁর গান। হেস্টিংসের যুদ্ধে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদল যখন মুখোমুখী, তখন মালমেমবেরির উইলিয়ামকে "আর্ল" (উইলিয়াম, নর্ম্যাণ্ডির আর্ল) বলেছিলেন রলাঁর গান আরম্ভ করতে, "কারণ সেই মানুষটির মরণপণ যুদ্ধের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করবে যোদ্ধাদের।"

মহাকবি ওয়েস্-এর মতে এ গান গেয়েছিল টেইলকের নামক এক নর্ম্যান। ওয়েস্-এর লেখার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন স্যর ওয়াল্টার স্কট্ ঃ

"মিষ্টি গলায় উচ্চকণ্ঠে গান গাইত টেইলকের,
দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল, বুঝি বা শের ;
দাঁড়িয়ে ডিউক, সম্মুখে তাঁর উঠল গেয়ে চারণ
উচ্চকণ্ঠে ঃ গানের ভাষায় শতেক বীরের মরণ,
চার্লস, রলাঁ, অলিভার আর আরও অনেক বীর
সর্বনাশা রঁস্ভর মাঠে দিয়েছিল যারা শির।"

গান গাইতে গাইতে টেইলকের তার তরবারিটা ছুঁড়ে দিয়েছিল শূন্যে। নিচের দিকে নেমে-আসা তরবারিটাকে সে লুফে নিল ডান হাতে, আর সকলে একযোগে চিৎকার করে উঠল, "ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।"

সে নিজের দাবী ঘোষণা করল। সামন্ততন্ত্রের অনুগামীদের অত্যন্ত যথার্থভাবেই 'সামন্ততন্ত্রের খোঁয়াড়'' বলে চিহ্নিত করা হত। তারা বলত যে বনভূমি, অরণ্য ও তৃণভূমি স্মরণাতীত কাল থেকে সামন্তপ্রভুরই সম্পত্তি, নিজের ভূমিদাস ও প্রজাদেরকে তিনি এসব ভোগ করতে দিয়েছিলেন মাত্র। ইংরেজ সামন্তপন্থীরা আবার এটুকুতেই তৃপ্তি হয়নি। তারা নিজেদের মত করে এক ইতিহাস বানিয়ে ঘোষণা করল যে ''ইংল্যাণ্ড কখনো কখনো ইউরোপের সামন্তায়নের সঙ্গে অনির্দিষ্টভাবে যুক্ত থেকেছে, আবার কখনো কখনো স্পষ্টতরভাবে যুক্ত থেকেছে নর্ম্যান বিজয়ের সঙ্গে। কিন্তু একসময় সমগ্র ইংল্যাণ্ডই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। প্রতিটা তালুক পরিণত হল সামন্তপ্রভুর খাস-সম্পত্তিতে। তারপর ঐ প্রভুরা জমিদারীর কিছুটা কিছুটা অংশ তাঁর স্বাধীন পোষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু কিছুটা অংশ রেখে দেন নিজের হাতে। এইসব জমিতে চাষ করত তাঁর ভূমি-দাসরা। আর এই ভাগাভাগিতে যা কিছু কাজে লাগল না, তা সামন্তপ্রভুর পোড়ো জমি হিসাবে চিহ্নিত হল। ঐ ভাগাভাগির পরবর্তী কালে সামন্ততান্ত্রিক নীতি-বহির্ভূত নানান প্রথা জন্ম নিল। সামন্তপ্রধানের সহনশীলতার ফলেই এইসব প্রথা অসচেতনভাবে বেড়ে উঠতে পেরেছিল।''[১]

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা এবং প্রচলিত রীতির ভয়ঙ্কর আইনজ্ঞ ও গোষ্ঠীগত জমির ধ্বংসকর্তা গার্লিন ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করেছেন সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির ব্যক্তিগত রূপটি খুঁজে বার করার। আর তা করতে গিয়ে তাঁরা গ্রহণ করেছেন অভিজাতদের স্বার্থবাহী তত্ত্বকে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস সামন্তপন্থীদের তত্ত্বের অগভীরতাকে প্রমাণ করবে, এবং দেখিয়ে দেবে যে জমিদারদের সম্পত্তি গড়ে উঠেছিল প্রতারণা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই।

১ এইচ. এম. মেইন, "গ্রামীণ জনগোষ্ঠী" পৃঃ ৮৪। হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এই মতামত রেখেছিলেন জনৈক আইনজীবি মিস্টার ব্রেমায়ার। পরিবেষ্টনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। ব্রেমায়ার সম্বন্ধে মিস্টার মেইন বলেছেন, "ইংল্যাণ্ডের স্থাবর সম্পত্তির স্বরূপ প্রচলিত রূপগুলি সম্বন্ধে এই সরকারী কর্মচারীটি অত্যন্ত ওয়াকিবহাল।"

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কর্তৃত্বের সংগঠন, যদিও তার জন্ম হয়েছিল সমকক্ষদের নিয়ে গঠিত এক সমাজের গর্ভ থেকেই। কিন্তু সমতা তো স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয় না। আসলে এর পিছনে কাজ করেছে বহু শতাব্দীব্যাপী নানান ঘটনার সম্মিলন। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবকে বুঝতে হলে এই বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার।

টিউটনিক্ গোষ্ঠীগুলি পশ্চিম ইওরোপ আক্রমণ করেছিল। এই টিউটনিক্‌রা ছিল যাযাবর। আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলি বর্বতার যে অবস্থায় ছিল, প্রায় সেই একই অবস্থাতেই ছিল এই টিউটনিক্‌রাও। স্ত্রাবো বলেছেন যে বেল্‌জিয়াম ও ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিষ্ঠিত বর্বররা কৃষিকাজ জানত না, তাদের খাদ্য ছিল দুধ আর মাংস—মূলত টাটকা অথবা শুকনো শূকরমাংস ; নেকড়ের মত হিংস্র ও ভয়ঙ্কর শূকরের পাল পুষতো তারা। দেশ-জোড়া সুবিস্তীর্ণ বনভুমিতে চরে বেড়াত এই শূকরের পাল। প্রচুর সংখ্যক শূকর ছিল ঐ বর্বরদের। এ থেকে তাদের খাদ্যও জুটতো, আর যে অল্প কয়েকটা জিনিস তাদের প্রয়োজন হত, তা-ও ক্রয় করা হতো এ থেকেই। স্ত্রাবো আরও বলেছেন যে গল্‌রাও একইভাবে জীবনযাপন করত, আর তাদের সম্বন্ধে জানতে হলে তাঁর সময়কার জার্মানদের গভীরভাবে জানা দরকার। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে সিজার দেখেছিলেন যে কেণ্ট-এ বসবাসকারী ব্রিটন্‌দের মধ্যে গলদের মত একই রীতিনীতি ও প্রথা চালু আছে : তারা চাষ করে না. দুধ আর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে, এবং চর্মনির্মিত পোষাক পরে। শত্রুকে ভয় দেখানর জন্য তারা নিজেদের শরীরকে নীলরঙে চিত্রিত করত। দশ-বারোজনের এক একটা দলের থাকত সার্বজনীন স্ত্রী, এবং ঐসব দল ভ্রাতা, পিতা ও পুত্র-সকলকে নিয়েই গড়ে উঠত।[১] ঠিক এই জায়গা থেকেই ইওরোপ ও অন্য সর্বত্রই সমাজের পথ-বদল শুরু হয়েছিল।

এইসব বর্বরদের মধ্যে এক ব্যাপকতম সমতা চালু ছিল। এরা প্রত্যেকই ছিল যোদ্ধা, শিকারী। এদের প্রথা ও রীতিনীতি এই বীরোচিত সমতাকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। যখন তারা এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বসল এবং আনাড়ির মত চাষ-বাস শুরু করল, তখনও ঐ যুদ্ধের অভ্যাস বজায় রাখার

১। "De Bello Gallico", ৫, অধ্যায় ১৪.

জন্য তারা নানান জায়গায় সামরিক অভিযান চালাতো। কোন খ্যাতিমান যুদ্ধ-প্রধান যদি শুধু ঘোষণা করতেন যে তিনি এক অভিযানে চলেছেন, তাহলেই দলে দলে যোদ্ধা ছুটে যেত তাঁর কাছে—লুঠপাট করার জন্য ও গৌরব অর্জনের জন্য তারা ছিল একান্ত উৎসুক। অভিযান চলাকালীন তারা ঐ প্রধানকে মান্য করে চলত, যেমন গ্রীক যোদ্ধারা মান্য করেছিল অ্যাগামেম্ননকে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রধানের সঙ্গে একই টেবিলে বসে আহার করত, ভোজ খেতো। প্রত্যেকেই লুঠের মালের সমান ভাগ পেতো, আর এই ভাগাভাগি করা হত লটারির মাধ্যমে। গ্রামে ফিরে এলে প্রত্যেকে আবার স্বাধীন ও সমকক্ষ হয়ে যেতো, যুদ্ধ-প্রধান হারাত তার কর্তৃত্ব।

এইরকম স্বাধীনতা ও সমতার মাধ্যমেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়রা এবং বস্তুত যাবতীয় বর্বরাই তাদের অভিযান চালাত। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে এই ধরনের জলদস্যু-সুলভ আচরণ বিদ্যমান থেকেছে। দিগ্বিজয়ী উইলিয়াম ও পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট যখন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ও আলবিজেন্‌সদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন, তখন তাঁরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পরাজিতদের কাছ থেকে যা লুঠ করা হবে, তার ভাগ দেওয়া হবে প্রত্যেককে। ব্যস, এতেই কাজ হয়েছিল, সৈন্য যোগাড় হয়ে গিয়েছিল তাঁদের। হেস্টিংসের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে উইলিয়াম তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেছিলেন: "সাহস-ভরে লড়াই করো, সবক'টাকে শেষ করো। জিততে পারলে আমরা সকলেই ধনী হবো। আমি যা পাবো তোমরাও তা-ই পাবে। আমি জিতলে তোমরাও জিতবে। আমি জমি পেলে তোমরাও পাবে।" ধর্মবিরোধী আলবিজেন্‌সদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বস্তদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ এই একই ভাষায় কথা বলেছিলেন মহান ধর্মগুরু পোপ: "উঠে দাঁড়াও খ্রীষ্টের সৈন্যরা। ঈশ্বর তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন (ঈশ্বর দিয়েছিলেন আগুন, লুণ্ঠন ও হত্যা), তা দিয়ে ধ্বংস করো অধার্মিকদের। দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দাও তুঁলোর আর্লকে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের। কেড়ে নাও, ওদের জমি-জায়গা যাতে করে এইসব অধার্মিকদের এলাকায় বসবাস করতে পারে গোঁড়া ক্যাথলিকরা।" ধর্মযুদ্ধের (Crusade) জন্য ইওরোপের যোদ্ধারা প্রাচ্যে গিয়েছিল। এইসব যুদ্ধের সেনাদলদেরও একইভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। একটা ভান হিসাবে রাখা-

হয়েছিল পবিত্র কবরকে রক্ষা করার কথা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন।[১]

এলাকা খুঁজতে গিয়ে বর্বররা যখন কোন দেশ জয় করত, তখন তারা সেখানকার অধীবাসীদের হয় হত্যা করত (দৈব নির্দেশ অনুযায়ী যেমনটা করত হিব্রুরা), আর নয়তো শুধু লুঠ-পাট করেই সন্তুষ্ট থাকত। তারপর ঐ দেশে তারা বসবাস করতে শুরু করত, নিজেদের মত করে চাষবাস করত। পরাজিতদেরকে তারা তাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি দিত, তারা নিজেদের প্রথা ও রীতি-নীতি পালন করার অধিকারও পেতো। কিন্তু যতই ঐ বর্বররা এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বসতে শুরু করল আর কৃষিজীবিতে পরিণত হতে থাকল, ততই তারা নিজেদের যোদ্ধাসুলভ অভ্যাসগুলি হারাতে শুরু করল। তাদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্য আদিম রীতিনীতি ছাড়তে পারত না। ট্যাসিটাস যে জার্মানদের দেখেছিলেন, তাদের বন্য হিংস্রতা তখনই অনেক কমে গিয়েছিল। তারা তখন স্থিতু হয়ে বসেছে, অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কৃষিকাজে। ক্যাটি গোষ্ঠীর লোকেরা অবশ্য তখনও যুদ্ধপ্রিয়ই ছিল। যুদ্ধের একেবারে সম্মুখ সারিতে সর্বদাই তারা সবথেকে বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়াত। তাদের কোন বাড়ি ছিল না, জমি ছিল না, আর এসবের জন্য তাদের কোন মাথাব্যথাও ছিল না। তারা যেখানেই যেতো, সেখানেই তাদেরকে থাকতে-খেতে দেওয়া হত। এইসব যোদ্ধারা যেন এক ধরনের স্থায়ী ফৌজ হিসাবে গড়ে উঠত, কৃষিকাজে নিযুক্ত স্বদেশবাসীদের রক্ষা করাই ছিল যাদের কাজ।

কিন্তু কখনই হানাদার বর্বররা এক জায়গায় স্থিতু হয়ে নিজেদের সহজাত বলিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলল, তখনই অন্য বর্বররা সহজলভ্য শিকারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর, আর পরাজিত মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়, তেমন আচরণই করতে লাগল তাদের সঙ্গে। বর্বররা বহু শতাব্দী ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইওরোপে। পূর্বদিকে গথ্, জার্মান ও হুণরা; উত্তর ও পশ্চিমে স্ক্যাণ্ডিনে-

১ প্রসিদ্ধ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এম. দ্য মলিনারি বর্তমান যুগের আর্থিক অভিযানকে অস্ত্রের মত তুলনা করেছেন মধ্যযুগের লুণ্ঠনমূলক অভিযানের সঙ্গে। দুটিরই লক্ষ্য হচ্ছে লুণ্ঠন করা—সত্য। কিন্তু একটা তফাৎ আছেঃ সামন্ততন্ত্রের আমলের যোদ্ধারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিত, আর পুঁজি-পতিরা, যারা ঠিক ইঁদুরের মত করে ১০ থেকে ২০ শতাংশ সুদ চর্বন করে, তারা শুধু নিজেদের পুঁজিটুকুরই ঝুঁকি নেয় এবং এই পুঁজির সৃষ্টি তারা নিজেরা করে না।

ভিয়রা ; দক্ষিণে আরবরা। যেখান দিয়েই তারা গেছে, সেখানকারই শহর ও গ্রামগুলিকে তারা একেবারে জনশূন্য করে দিয়েছে। তারপর একসময় পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ইওরোপে এই মানুষের স্রোত ধেয়ে আসা বন্ধ হল, অবসান ঘটল বর্বরদের যাযাবর জীবনের, এবং যে সভ্যতার ক্রিয়াকে তারা অবরুদ্ধ ও ব্যাহত করেছিল, তা আবার আরম্ভ করল। আর তখনই দেখা দিল আরেক উৎপাত। সশস্ত্র মানুষদের নানান দল ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। তারা লুঠপাট চালাতে লাগল, সব জায়গা থেকে অর্থ আদায় করতে লাগল। যুদ্ধ শেষ, পরস্পর বিরোধী সৈন্যবাহিনীর সৈনিকরা পরিণত হয়েছে পরস্পরের মিত্রে, এবং এবার তারা নিজেরাই এক অভিযান শুরু করেছে।[১]

ডাকাতি, মানুষ-চুরি আর হত্যার এক অবিরাম আতঙ্কের মধ্যে মানুষকে বাস করতে হয় বেশ কয়েকশ বছর। বর্বরদের আক্রমণে দেশটা ধ্বংস হয়ে যায়, চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু তার ফলে আগে থেকেই স্থিতু হয়ে বসা গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেকার কলহের অবসান ঘটেনি। এই অবিরাম পারস্পরিক কলহের ফলে বৈদেশিক আক্রমণের সামনে বর্বর জাতিগুলি অসহায় হয়ে পড়েছিল। সাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের পারস্পরিক গোষ্ঠীগত ঘৃণা ও গ্রামীণ দ্বন্দ্বকে তারা মিটিয়ে নিতে পারেনি। রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল ট্যাসিটাসের একমাত্র লক্ষ্য। এই সর্বনাশা কলহ বাড়িয়ে তোলার জন্য তিনি মিনতি জানিয়েছিলেন দেবতাদের কাছে। তিনি বলেছেন, "নিয়তি রোমকে যে

১ পয়েক্‌টায়েস'-এর যুদ্ধের পর (১৩৫৬) সৈনিকরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন তারা একজোট হয়ে নিজেরাই যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ফ্রান্সের রাজা জন ইংল্যাণ্ডে বন্দী ছিলেন। ব্রতিনি-র চুক্তির ফলে তিনি মুক্তি পান। তারপর, ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে, দু'পক্ষেরই সৈনিকদের কর্মচ্যুত করা হয়। তারা নিজেরাই তখন দল তৈরী করে ময়দানে নেমে পড়ে। একটি দল উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালায়। এর থেকেও বড় দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ত্যালের্ঁয়া পেরিগর্দ। এই দ্বিতীয় দলটি রোন্‌ নদীর উপত্যকায় আক্রমণ চালায়। লা প্রভাঁস্‌ বিধ্বস্ত করে দলটি আভিনোঁর মধ্যে দিয়ে এগোয়। এখানে পোপ ঐ বাহিনীর প্রধানদের ভোজসভায় অপ্যায়িত করেন, সমস্ত পাপ থেকে তাদের মুক্তিদান করেন, আর সৈনিকদের হাতে তুলে দেন ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। যাত্রাপথে সৈনিকরা শহরগুলিতে লুঠপাট চালায়, সারা দেশটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়।

সর্বাধিক মঙ্গল প্রদান করতে পারে, তা হচ্ছে তার শত্রুদের মধ্যেকার বিরোধ।"[১] নিরাপত্তার স্বার্থে শহর এবং প্রদেশের অধিবাসীরা সুরক্ষিত জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। ১১-শ ও ১২-শ শতাব্দীর অভার্‌-র সনদে এইসব গ্রামকে castra (শিবির) নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ অবরোধ সহ্য করার কথা মাথায় রেখেই শহর ও নগরের বাড়িগুলি তৈরী করা হয়েছিল।

শুরুতে, গ্রাম-যৌথগুলি গড়ে উঠেছিল প্রায় একই গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের নিয়ে, যারা অধিকারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমকক্ষ ছিল। গ্রাম যৌথগুলির সদস্যরা নিজেদের গ্রাম-প্রধানদের নির্বাচিত করত। এদের মূলত দায়িত্ব ছিল গ্রামবাসীদের রক্ষা করা। কালক্রমে এদের হাতে এল নানান অধিকার—বিচার করার অধিকার, বিবাদ মেটানর অধিকার, প্রথা ব্যাখ্যা করার ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অধিকার। ফ্র্যাঙ্করা তাদের বর্বর লাতিন ভাষায় এই প্রধানদের বলত 'গ্রাফিয়ো'। শব্দটা এসেছে 'গ্রাফ্' থেকে, যা হচ্ছে জার্মান কাউন্ট-এর প্রতিশব্দ। গ্রাম-যৌথের এই নির্বাচিত প্রধানরাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণদের ভ্রূণরূপ।

প্রথমে এই প্রধানরা ছিল বর্ষীয়ানদের পরিষদের ও গণ-পরিষদের কর্তৃত্বাধীন সার্বজনীন কর্মকর্তা মাত্র, আর ঐ সব পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। কর্তব্যে কোনরকম গাফিলতি করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।[২] ফ্র্যাঙ্কদের কোন গোষ্ঠীর পরিষদ যদি কোন বিদেশীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিত, আর গ্রাফিও যদি সেই আদেশ কার্যকরী না করত, তাহলে ২০০ স্বর্ণমুদ্রা (Lex Salica) জরিমানা দিতে হত তাকে। খুনের শাস্তি মকুব করার জন্যও একই পরিমাণ জরিমানা তাকে দিতে হত (Weregild)। যে সব ক্ষমতা পরবর্তীকালে সামন্তপ্রভুদের নিজস্ব হয়ে উঠেছিল, সে সব ক্ষমতা

১। "Germania", ১, অধ্যায় ২৮.

২। বার্ণ-এর পরিষদের আলোচনা শুরু হত স্বাধীনতা সংক্রান্ত এক উদ্ধত ঘোষণা দিয়ে—"এইগুলি হচ্ছে বার্ণ-এর প্রচলিত রীতিসমূহ। এটা দেখায় যে প্রাচীনকালে বার্ণে কোন প্রভু ছিল না। এখানকার বাসিন্দারা বিগোরের এক নাইটের খ্যাতি শুনে তাকে খুঁজতে বেরোয়, তারপর তাকে এক বছরের জন্য প্রভু করা হয়। কিন্তু সে আমাদের রীতিনীতি মানতে চায়নি। পাউ-এর জন-পরিষদ তাকে এইসব রীতিনীতি মান্য করার আদেশ দেয়……, সে তা পালন করে না। তখন সভার মধ্যেই তাকে হত্যা করা হয়।"

তখন ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর হাতে। গোষ্ঠীর সকলে একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিত (Folkmoote)। প্রতিটি বাসিন্দা সশস্ত্র হয়ে সভায় যোগ দিতে বাধ্য ছিল, নাহলে দণ্ড হিসাবে জরিমানা দিতে হত। কোন কোন গ্রাম-যৌথের অধিকারে ভূমিদাস থাকত, যেমন থাকত পরবর্তীকালের সামন্ত-প্রভুদের।

রাজা হোয়েল্-ডু-র নির্দেশে ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌স্-এর আইন সংগৃহীত হয়, আর ১৮৪১ সালে এ. ওয়েন তা প্রকাশ করেন। ঐ আইনে গ্রাম-প্রধানদের নির্বাচনের পদ্ধতি এবং তাদের কী কী গুণ থাকা দরকার ও কোন্ কোন্ কাজ করতে হবে —তা বলা হয়েছে। এই গুণ ও কাজগুলি বর্বর জাতিদের যুদ্ধ-প্রধানদের গুণ ও কাজের থেকে খুব একটা পৃথক কিছু নয়। যেসব পরিবার-প্রধানের স্ত্রী ও বৈধ সন্তানাদি থাকত, তাদের প্রত্যেকে মিলে তাদের গোষ্ঠী-প্রধান নির্বাচিত করত। এই নির্বাচিত প্রধান তার মৃত্যু পর্যন্তই প্রধান হিসাবে কাজ করত। কোন কোন গোষ্ঠীতে আবার তার কাজগুলি ছিল সাময়িক ও বাতিলযোগ্য। অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে বলা থাকত, "যে তিনি তাঁর জ্ঞাতিবর্গের হয়ে কথা বলবেন, এবং তাঁর কথা শুনতে হবে ; তাঁর জ্ঞাতিবর্গের পক্ষে তিনি সংগ্রাম করবেন, এবং তাঁকে ভয় করতে হবে ; তাঁর জ্ঞাতিবর্গের হয়ে তিনি জামিন থাকবেন, এবং তাঁকে জামিনদার হিসাবে মেনে নিতে হবে।" প্রধান যখন বিচার করত, তখন তাকে সাহায্য করত সব থেকে বয়স্ক সাতজন গ্রামবাসী। একজন জল্লাদ উপস্থিত থাকত, যে ঐ প্রধানের শাস্তির নির্দেশ অনুসারে হত্যা করত। কারণ সেই যুগে বিচার মানেই ছিল প্রতিশোধ (lex talionis)—আঘাতের বদলে আঘাত, ক্ষতের বদলে ক্ষত। উচ্চকণ্ঠে নালিশ জানানোর পর সঙ্কেতধ্বনি করা হত। এই সঙ্কেতধ্বনিকে নর্ম্যানরা বলত 'হ্যারো' আর বাস্কেরা বলত 'বায়াফর'। নিয়ম ছিল—প্রথম সঙ্কেতধ্বনির পরই হাতে অস্ত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং প্রধানের নির্দেশ পালনের জন্য তৈরী থাকতে হবে। এই গ্রাম-প্রধান এক সামরিক নেতা, প্রতিটি গ্রামবাসীই যার অনুগত ও বাধ্য। তার আবেদনে কেউ সাড়া না দিলে তার জরিমানা হত। কোন কোন নগরে সামরিক সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন, তার্বেস্-এর অধিবাসীরা দশটি পরিবার পিছু একটি করে দল গঠন করত, যে দলগুলির প্রতিটিরই একজন করে নেতা থাকত। দলের প্রতিটি পুরুষ সশস্ত্র কিনা এবং তাদের অস্ত্রগুলি ভাল অবস্থায় আছে কিনা—এইসব দেখাশোনা করাই ছিল ঐ নেতাদের

কাজ।[১]

বর্বর গোষ্ঠীগুলির যাবতীয় কাজকর্ম কয়েকটি পরিবারের অধিকারে চলে যায়। তাঁতি, কামার, যাজক এবং যাদুকরের বৃত্তি পুরুষানুক্রমে বর্তায়। আর এইভাবেই জাত-পাতের জন্ম হয়েছে। গোষ্ঠী প্রধানের দায়িত্ব ছিল আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা। এই প্রধানকে বাছাই করা হত সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল—একই পরিবার থেকে গ্রাম-প্রধান বাছাই করা হচ্ছে। একসময় এই পরিবারটি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে থেকে গোষ্ঠী-প্রধান মনোনীত করতে শুরু করল, বাতিল করে দিল নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতাটুকুও। প্রথমদিকে কিন্তু গ্রাম-প্রধানের কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকত না। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন পর্যন্ত গ্রাম-প্রধান হওয়া মোটেই লোভনীয় ব্যাপার ছিল না, কারণ গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিটি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাকে জরিমানা দিতে হত। কোক্স্টোনে মেয়র বা কোন জুরি (Jurat) নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, "সাধারণ মানুষরা তাদের খাস বসতবাড়িটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত।" হেস্টিংসে নিয়ম ছিল যে "সাধ্যপাল (bailiff) তার দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে সমস্ত সাধারণ মানুষ গিয়ে তার বসতবাড়িটি ধ্বংস করে দেবে।"[২]

উচ্চ পদমর্যাদা বিপজ্জনক ছিল। বিরাট কোন বিপর্যয়ের সময়, যেমন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়রা তাদের রাজাকে বলি দিত। অর্থাৎ, দেব আনুকূল্য লাভের জন্য একেবারে সর্বোচ্চ মূল্যই দেওয়ার চেষ্টা করত তারা। এইভাবে, এক বিরাট দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটানোর জন্য ওডিন্-এর নামে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সুইডেনের ভাম্বাল্যাণ্ড প্রদেশের প্রথম রাজাকে। নরওয়ের আর্ল হাকন্ জম্স্বার্গ জলদস্যুদের পরাজিত করার ব্যাপারে ওডিন্-এর আনুকূল্য লাভের জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিয়েছিলেন। একই কারণে নিজের মেয়েকে জিহোভার নামে বলি দিয়েছিলেন গাইডন্।

বর্তমান কালের ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে নানান ধরণের জন-কর্মী

১। L. Deville, "Etudes historiques sur Tarbes". Bulletin de la Societe Academique des Hautes Pyrenees, sixieme annce, deux livraison, ১৮৬১.

২। গোমে, "গ্রামীন জনগোষ্ঠী", পৃঃ ২৫৪.

দেখা যায় যেমন তাঁতি, কামার, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ, নর্তকী ইত্যাদি। এরা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে, আর এর বদলে গোষ্ঠী থেকে তাদেরকে দেওয়া হয় একটি করে বাসগৃহ, কিছুটা পরিমাণ শস্য, আর খানিকটা জমি। এই জমিতে তাদের হয়ে গোষ্ঠীর গ্রামবাসীরাই চাষের কাজ করে দেয়।[১]

"প্রাচীন গ্রীসে 'demiurgoi'-রা ছিল এই হিন্দু জন-কর্মীদের সমতুল। ঘোষক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও চারণদের কথা উল্লেখ করেছেন হোমার। এরা ঠিক কী কাজ করত, আজ আর তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল। কেল্‌টিক্ গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও এই ধরণের শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।"[২]

হিন্দু গ্রামের জন-কর্মীদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়, ঠিক তেমন আচরণই করা হত গ্রাম-যৌথের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানদের সঙ্গেও। তাদের কাজের প্রতিদান হিসাবে গ্রামবাসীরা তাদের জন্য গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দার থেকে বেশি পরিমাণ জমি বরাদ্দ করত। মাল্‌মেস্‌বেরি নগরে অল্ডারম্যানই ছিল নগর প্রধান। এই অল্ডারম্যান যাতে নিজের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেন, তার জন্য প্রতি বছর তাঁকে কিছুটা করে জমি দেওয়া হত। এই জমিকে বলা হত "অল্ডারম্যানের রন্ধনশালা"। তাঁর ঐ জমিতে নগরের সাধারণ মানুষরাই চাষের কাজ করত, এবং নিজেদের ফসল ও গবাদি পশুর ভাগ দিত তাঁকে।[৩]

প্রথম দিকে এই নির্বাচিত প্রধানের কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কিন্তু

---

১ যে ব্যক্তির জন্য এই সব জমি দেওয়া হত, প্রায়শই সেই ব্যক্তির নামেই চিহ্নিত হত জমিটি। মেইন্ বলেছেন, "ইংল্যাণ্ডের বেশ কিছু বিভাগের সার্বজনীন জমিতে এমন কিছু কিছু ভূমিখণ্ড দেখা যায়, যেগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে চিহ্নিত। আর সাধারণ মানুষ একথা বিশ্বাস করে যে জমি যে ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত, বৈধভাবে সেই জমির মালিক এমন কেউ হতে পারে না, যে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত নয়।"

২ ডঃ হার্ণ, "আর্য গৃহস্থালি", পৃঃ ১৫০.

৩ "প্রধানদের প্রথমা পত্নীর ব্যক্তিগত ভরণ-পোষণের জন্য বরাদ্দ জমি চাষ করে বীজ বপন করার জন্য প্রতি বছর জমায়েত হত বাসতোরা। শত শত মানুষ এক সরলরেখায় সার বেঁধে দাঁড়াত। সমান তালে যুগপৎ ওটা-নামা করত তাদের হাতের কোদালগুলি। প্রধানের ভরণ-পোষণের জন্য একত্রিত হত গ্রামের সমস্ত মানুষ।" ক্যাসালিস, "দ্য বাসুতোজ।"

প্রতিবার একই পরিবারের মধ্যে থেকে প্রধান বাছাই করার ফলে এক বিশেষ সুবিধার জন্ম হল, আর এই সুবিধা কালক্রমে পরিণত হল বংশগত অধিকারে। ঐ বিশেষ সুবিধাভোগী পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি, কোনরকম নির্বাচন ছাড়াই, স্রেফ উত্তরাধিকারসূত্রে, গ্রাম-প্রধানের পদ দখল করত। ফ্রাঙ্কদের গোষ্ঠীগুলির প্রধানরাও এইভাবেই একজনের পর আরেকজন ক্ষমতা অধিকার করত। গোষ্ঠীর পরিবারগুলির প্রধানদের নিয়ে গড়ে উঠত, 'লিউড' leude) সামরিক প্রধানদের বাছাই করা। যাদের দায়িত্ব ছিল হিব্রুদের মতই লোভ গোষ্ঠীর মানুষরাও তাদের যাজককে বাছাই করত। এই যাজকরা রাজার সঙ্গে বসবাস কবত, এবং রাজমন্ত্রনাসভায় অংশগ্রহণ করত। অবস্থাবিশেষে এরা রাজার বিরোধিতা কবত, এমনকি প্রয়োজনে শক্তিপ্রয়োগ করত। এই লিউড্‌রাই রাজাকে নির্বাচিত করত, আব কালক্রমে রাজার কার্যকলাপ বংশানুক্রিম হয়ে উঠেছিল।

গ্রাম-যৌথগুলি সারাক্ষণ একে অপরের সঙ্গে মাঝেমাঝেই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধে অধিকৃত জমি বণ্টনের সময় প্রধান এবং তার পরিবার নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ জমি পেতো। সম্পত্তির অধিকার কালক্রমে জন্মগত অধিকার দিয়েই নির্দ্ধারিত হতে শুরু হয়।

গ্রাম প্রধান নির্বাচনের পব গ্রামের সবচেয়ে প্রশস্ততম বসতবাড়িটির মালিক হত ঐ নির্বাচিত প্রধান। ঐ বসত বাড়িটি বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের কারণে সব থেকে সুরক্ষিত কবা হত, যাতে কোন জরুরী প্রয়োজনে সেটা গ্রামবাসী কৃষকদের আশ্রয় লাভেব পথে সবথেকে উপযুক্ত হয়। আদতে হয়ত এই বণনৈতিক সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারটা নেহাৎই ঘটনাচক্রে ঘটত। কিন্তু একসময় প্রত্যেক গ্রাম-প্রধানের কাছ থেকে এই সুবিধা পাওয়াটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় গ্রামগুলিতে সীমান্তের পাশে বুর্জ বা প্রহরা-চৌকি সর্বদাই প্রধানের বাড়ির সাথে থাকত এবং সারাক্ষণই এগুলিকে আশ্রয় নেওয়া ও নজরদারীর কাজে ব্যবহার করা হত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রত্যেক সামন্ত-প্রভুকে একটা দুর্গ বা অঙ্গনসহ একটা সুরক্ষিত বাড়ি বানাতেই হত। দুর্গের চারিদিকে থাকত পরিখা আর নামানো-ওঠানো যায় এমন সেতু। থাকত একটা বড় চারকোনা প্রহরা-চৌকি ও পেষাই-কল। কৃষকরা যাতে সেখানে নিজেদের ফসল ও গবাদি পশুকে নিরাপদে রাখতে, শস্য পেষাই করতে এবং নিজেদের নিরপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে— তার জন্যই এই ধরণের বন্দোবস্ত করা হত। গ্রাম-প্রধানের বসতবাড়িটিকে এক ধরণের সার্বজনীন বাড়ি বলে মনে করা হত, আর বিপদের সময় ঐ বসতবাড়িটি

সার্বজনীন বাড়িই হয়ে উঠত। বাড়িটি মেরামতের কাজে, ওটিকে সুরক্ষিত করা, দেওয়াল ও পরিখা বানানোর কাজে হাত লাগাত গ্রাম-যৌথের সদস্যরা। প্রথা ছিল—গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দার বাড়ি তৈরী ও মেরামতের কাজেই সাহায্য করতে হবে অন্য সকলকে, এবং এ ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা চলবে না। সামন্তপ্রভুর হাতে "যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষামূলক নির্মাণকার্যে সাহায্য করতে নিজের পোষ্য ও প্রজাদের বাধ্য করার" যে অধিকার থাকত, তার উৎস ছিল এই প্রথাই। সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক লেখকের মন্তব্য এই অধিকারের উৎসকে চিহ্নিত করেছে। "এইসব আত্মরক্ষামূলক কাজ গ্রাম ও শহর উভয়ের নিরাপত্তাকেই জোরদার করত, মানুষের প্রাণ বাঁচাত এবং সম্পত্তি রক্ষা করত। তাই, কোথাও নিজের জমি থাকা সত্ত্বেও সেখানে বসবাস করে না, এমন সব লোকেদেরও ঐ আত্মরক্ষামূলক কাজে অংশ নিতে হয়।"

বর্বররা চাষের কাজে যতটা দক্ষ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি দক্ষ ছিল যুদ্ধের কাজে। নিজেদের ঘর-বাড়ি ও গ্রামকে তারা নিজেরাই রক্ষা করত। প্রথম সঙ্কেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হয়ে তারা ছুটে বেরোত, প্রধানের নির্দেশ মাফিক হানাদারদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াত। প্রহরা-চৌকিতে দিনের বেলাতেই প্রহরীদের তুলে দেওয়া হত; সারারাত তারা নজর রাখত চতুর্দিকে। অনেক জায়গায় নিজের পোষ্যদের দিয়ে দিবারাত্র পাহারা দেওয়ানোর অধিকার থাকত সামন্ত-প্রভুর। কিন্তু একসময় তাদের চাষ-বাসের অভ্যাসই বড় হয়ে উঠল। কারণ এইসব কাজে কৃষকদের চাষের ক্ষতি হত। তারা তাই সামরিক কাজের বদলে সামন্ত-প্রভুকে কিছু কর দিতে শুরু করে। শর্ত হল—সামন্ত-প্রভু একদল সশস্ত্র সৈন্য রাখবে, যারা শুধুমাত্র গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার কাজই করবে। প্রতিটি অপরাধীর ওপর যে জরিমানা ধার্য করা হত, তার একটা অংশ সরিয়ে রাখা হত প্রধান ও তার সৈনিকদের জন্য। এইভাবে গ্রাম-প্রধানের হাতে এল সশস্ত্রবাহিনী রাখার অধিকার। আর একসময় এরই জোরে সে সক্ষম হল নিজের ইচ্ছাকে সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে, এবং নিজের পুরনো সহচরদের ওপর প্রভুত্ব করতে।

যে সব গ্রাম সামরিক দিক দিয়ে সবথেকে ভাল জায়গায় গড়ে উঠত, সেই সব গ্রাম আশপাশের অঞ্চলের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হত। কোন আগ্রাসনের ঘটনা ঘটলে আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা ঐ গ্রামে জড়ো হত আশ্রয়ের জন্য। বিপদের সময় এই আশ্রয় পাওয়ার প্রতিদান হিসাবে তারা ঐ গ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মেরামতির জন্য ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ সাহায্য

করত। এইসব গ্রামের প্রধানদের কর্তৃত্ব চারপাশের গ্রামগুলিতেও বিস্তৃত হত। যৌথতাবাদী গ্রামগুলির সকল সদস্যই অধিকারে ও কর্তব্যে সমকক্ষ ছিল। কিন্তু এই স্বাভাবিক পথে ঐসব গ্রামে সামন্ততন্ত্রের প্রথম উপাদানগুলি সৃষ্টি হল। শত শত বছর ধরে তারা হয়ত ভারতবর্ষের মত একই অবস্থায় স্থির থাকতে পারত, কিন্তু বহিঃস্থ নানান ঘটনার আঘাত তাদের স্থিতিকে বিঘ্নিত করে এক নতুন জীবন সঞ্চারিত করল। যুদ্ধ ও যুদ্ধজয় তাদের মধ্যে এই ভ্রূণাকার বীজগুলিকে বিকশিত করে তুলল এবং সেগুলি একত্রিত ও সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলল এক বিশাল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। মধ্যযুগে সারা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা।

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে যা ঘটেছে, তা থেকে আমরা গ্রাম-প্রধানকে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যারণে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে যুদ্ধজয়ের ভূমিকাকে বুঝতে পারি। ইংরেজরা একসময় ভারতবর্ষের সমুদ্র উপকূলগুলিতেই আস্তানা গেড়েছিল। তারপর তারা দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের এলাকা প্রসারিত করল। উপরোল্লিখিত ধরণে গড়ে-ওঠা গ্রামগুলির সঙ্গে তখন তাদের সংযোগ ঘটল। প্রতিটি কৃষিজীবি গোষ্ঠী একজন কৃষকের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। এই কৃষকটিই হচ্ছে তাদের মোড়ল, সেইকথা বলত, আলোচনা করত আগন্তুক বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে। এই মোড়লের ক্ষমতার উৎস ও নির্দিষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে বা গোষ্ঠীর মধ্যে তার কাজ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান চালায়নি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। তারা ধরেই নিয়েছিল যে ঐ মোড়লরাই হচ্ছে গ্রামের প্রভু, আর সেই মতই ব্যবহার করত তাদের সঙ্গে। কিন্তু আসলে মোড়লরা ছিল গ্রামের প্রতিনিধি মাত্র। সবথেকে শক্তিশালী হওয়ার অধিকার যতটুকু প্রভাব প্রদান করে, তার সবটুকু দিয়ে তারা মোড়লের কর্তৃত্বকে বাড়িয়ে তুলেছিল ও দৃঢ়তর করেছিল। নিজের পূর্বতন সহচর গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন চালানো এবং তাদের অধিকার ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে অনেক সময়ই মোড়লকে সাহায্য করত তারা। মধ্যযুগীয় বিজেতারাও একইভাবে কাজ চালাতো। গ্রামের একেবারেই গুরুত্বহীন পদগুলিতে তারা স্থানীয় প্রধানদের অধিকার নিশ্চিত করত। এই পদগুলি এতই গুরুত্বহীন ছিল যে ঐ প্রধানদেরকে তাদের অধীনস্থদের প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হত আর এর বদলে তাদেরকে কর আদায় করার ও অধীনস্থদের আচার-আচরণের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব নিতে হত। কিন্তু বিজেতারা মোড়লদের হাতে এক নতুন কর্তৃত্ব দিল, যে কর্তৃত্ব গ্রাম-যৌথের আমলে এতদিন তাদের ছিল না। কিন্তু রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জায়গায়

তারা তাদের নিজেদের একজন করে যোদ্ধাকে নিযুক্ত করল। এদেরকে সামরিক পদে 'benefices' বহাল করা হয়। এই পদে একজন কতদিন থাকতে পারবে, তা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল, প্রথমদিকে এদেরকে যখন ইচ্ছা বরখাস্ত করা যেতো, পরের দিকে সারাজীবনের জন্যই নিয়োগ করা হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পদ বংশগত হয়ে ওঠে। এই পদের স্বত্বভোগী প্রজারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের বংশগত জমি-জায়গাকে লাখেরাজ (alodial) সম্পত্তিতে পরিণত করত। লাখেরাজ, অর্থাৎ যে জমি যাবতীয় কর ইত্যাদি থেকে মুক্ত। ফ্রান্সের তৎকালীন রাজারা এই ধরণের জমি দখলের বিরুদ্ধে বারবার নানান নির্দেশ জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। "যে লোক সম্রাটের বা চার্চের কোন স্বত্ব ভোগ করে, সে যেন তাকে তার পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত করতে না পারে,"—৮০১ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘোষণাপাত্রে শার্লম্যান বলেছিলেন (ঘোষণাপত্র ৮, অধ্যায় ৩)। কিন্তু সামরিক প্রধানদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণে রূপান্তরিত হওয়াকে এইসব নির্দেশ দিয়ে ঠেকানো যেতো না। তাই বলা যায় সে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এক দ্বি-মুখী উৎস ছিল : একদিকে, গ্রাম-যৌথগুলি যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিবর্ধিত হয়েছিল, সেই অবস্থার গর্ভ থেকেই এর জন্ম হয়েছিল ; আর অন্যদিকে, এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল বিজয়াভিযানের মধ্যে থেকে।

ঘটনার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গ্রাম-প্রধান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণে পরিণত হত, অথবা বিজেতাদের দ্বারা নিযুক্ত যে সামরিক প্রধানরা সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণে পরিণত হত, তারা উভয়ই ঐ গ্রামের বসবাস করতে বাধ্য ছিল, আর তাদের দায়িত্ব থাকত গ্রামের শাসনকার্য চালানো ও গ্রামকে রক্ষা করা। তাদের অধিকারে একটা অঞ্চল থাকত আর লোকে তাদেরকে খাজনা দিত কায়িক শ্রম ও উৎপন্ন ফসল দিয়ে। আসলে তাদের এক্তিয়ারে থাকা কৃষকদের জন্য তারা নানান কাজ করত, আর এগুলি ছিল সেইসব কাজেরই প্রতিদান স্বরূপ। ব্যারণ ও তার সশস্ত্র অনুচররা একটা স্থায়ী ফৌজ হিসাবে গড়ে উঠত। এই ফৌজ যে গ্রামবাসীদের রক্ষা করত, তারাই এদের প্রতিপালন ও ভরণপোষণের ভার নিত।[১]

১. রোম্যান্স্ (Romance) ভাষায় সামন্তপ্রভুকে বলা হত ব্যারণ। ব্যারণ শব্দের অর্থ ছিল শক্তিশালী মানুষ, সাহসী যোদ্ধা। সামন্ততন্ত্রের একান্ত নিজস্ব সামরিক চরিত্রটা এ থেকেই বোঝা যায়। আর 'ভ্যাসাল' (পোষ্য) শব্দের অর্থও ছিল সাহসী, শৌর্যময়।

ব্যারণরা তাদের পোষ্যদের জন্য ন্যায়বিচার, সাহায্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত, আর প্রতিদানে পোষ্যরা তাদের প্রভুকে দিত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা। সামন্তপ্রভু বা তার কোন প্রজার মৃত্যুর কাল একটা পরিবর্তন ঘটতো। এইরকম প্রতিটা পরিবর্তনের সময় ৪০ দিনের মধ্যে সামন্তপ্রভুর দুর্গে যেয়ে প্রজারা তাদের পুরোনো সম্পর্ক নতুনভাবে স্থায়ী করত। অন্য কোথাও নয়, ব্যারণের দুর্গেই। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রয়োজনে ব্যারণের দুর্গে আশ্রয় নেওয়া এবং ব্যারণ কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার কথা চিন্তা করেই সে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিত। সামন্ত প্রভুটি অনুপস্থিত থাকলে অথবা কোন প্রতিনিধি রেখে না গেলে প্রজাটি দুর্গদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আনুগত্যের শপথ উচ্চারণ করত, এবং তার এই শপথ নেওয়ার কথাটা নথিভুক্ত করাতো। সামন্ত-প্রভুর কাছে আসার সময় তার মাথায় কোন আবরণ রাখা চলত না, কোমরবন্ধের ফিতা খোলা থাকত, তাতে কোন তরবারি থাকত না, গায়ে থাকত না শাল। হাতজোড় করে নতজানু হয়ে বসতে হত তাকে। শপথ নেওয়ার পর সামন্ত-প্রভু প্রজার হাত নিজের হাতে নিতেন। এটা ছিল ঐক্য ও নিরাপত্তাদানের প্রতীক। তারপর প্রজাটি পরপর তার জমি-জায়গার কথা উল্লেখ করত—এগুলিকে সে তার প্রভুর নিরাপদ আশ্রয়ে গচ্ছিত রাখছে। প্রাচীনকালে প্রজারা তাদের জমি থেকে একটুকরো মাটির চাপড়া নিয়ে আসত সঙ্গে করে। কখনো কখনো নিজের প্রজার ব্যাপারে সামন্ত-প্রভুই আগে শপথ নিত। ফর্স দ্য বিগোর-এ (বিগোর-এর প্রথা) বলা হয়েছে যে কঁৎ দ্য বিগোর "শপথ নিতে আসা প্রজার শপথ গ্রহণ করার আগে নিজেই এক শপথ উচ্চারণ করতেন। ঐ শপথে বলা হত যে প্রাচীন প্রথার কোনকিছুই তিনি পাল্টাবেন না, প্রজার কোন অধিকারেও হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁর জমিদারীর চারজন অভিজাত ব্যক্তি শপথ নিয়ে সামন্ত-প্রভুর ঐ শপথকে সমর্থন করবে।"

"যখন কোন বিদেশী সেনাবাহিনী সামন্ত-প্রভুর এলাকায় আক্রমণ চালায়, এবং তিনি তাঁর অবরুদ্ধ দুর্গকে অবরোধ-মুক্ত করতে চান, অথবা যখন তিনি কোন ঘোষিত যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন", তখন প্রজারা তাদের প্রভুর পাশে দাঁড়াতে বাধ্য ছিল, এখানে যুদ্ধ বলতে যে যুদ্ধ অধিবাসীদের স্বার্থেই করা হচ্ছে। কখনও কখনও তারা তাকে পরিত্যাগও করতে পারতো। কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রভুকে পরিত্যাগ করা যাবে, তা ৮১৩ থেকে খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন—যদি তার প্রভু তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে বা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়, তাকে যদি লাঠি বা তরবারি

দিয়ে আঘাত করে, তার স্ত্রী বা কন্যার শ্লীলতাহানি করে, কিম্বা যদি তার পৈতৃক সম্পত্তি কেড়ে নেয়। এই ধরণের অবস্থায় প্রজা তার সামন্ত-প্রভুকে পরিত্যাগ করতে পারতো।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই এই কর্তৃত্ব দেশের মধ্যে নানান সমস্যারও জন্ম দিতে শুরু করল, অথচ দেশকে রক্ষা করাই ছিল তার দায়িত্ব। নিজেদের এলাকা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যারণরা নিজেদের মধ্যে বিরামহীনভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যেতো। শুধু মাঝে-মধ্যে চাষের কাজের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন হত। ব্যারণদের এই যুদ্ধকে তুলনা করা যায় আধুনিক কালের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে। ঐ যুদ্ধ এবং এই প্রতিযোগিতা দুটিরই এক ফলাফল। দুটিই শেষপর্যন্ত সম্পত্তিকে কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করে, আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় তাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব। পরাজিতদের যখন একেবারে খুন করে ফেলা হত না বা সর্বব লুণ্ঠন করে নেওয়া হত না, তখন তারা পরিণত হত বিজেতার দাসে, যে বিজেতাই তাদের বেশীর ভাগ জমি ও দাসদের দখল করে নিয়েছে। বড় বড় ব্যারণদের দাপটে ছোট-খাট ব্যারণরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বড় বড় ব্যারণরাই হয়ে উঠল সামন্ততন্ত্রের প্রভাবশালী লোকজন। তারা ডিউকদের দরবার বসাতে শুরু করল। তাদের অধীনস্থ জমিদাররা এই দরবারে হাজির থাকতে বাধ্য ছিল।

এইসব ব্যারণরা প্রায়শই দস্যুতে পরিণত হত। তারা ক্ষেতের ফসল লুঠ করত, শহরে ডাকাতি করত, ভ্রমণকারীদের ওপর লুঠ-পাট চালাত। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাদেরকে (gens-pille-hommes, gens-tue-hommes) নরঘাতক ও চোর নামে চিহ্নিত করা হত।[১]

১. পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট-এর দূত ভিট্রি, যিনি জার্মানী ও বেলজিয়ামে আইবিজেনসদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন (১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে), তিনি লিখেছেন ঃ "নিজেদের অত খেতাব ও পদমর্যাদা সত্বেও জমিদাররা লুঠ-পাট চালিয়েই যায়, চালিয়ে যায় ডাকাতি, ও রাহাজানি। আগুন লাগিয়ে তারা ছারখার করে দেয় গোটা এলাকাটাকে।" যাজকরাও ছিল একই গোয়ালের গরু। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নরবোন-এর আর্চবিশপ তাঁর যাজকীয় অনুশাসনের বলে তার আর্কডিকনদের নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজ ছিল বন্য জীবজন্তু শিকার করা, কৃষকদের ওপর লুঠ-

শহরগুলি বাধ্য হত রাজা বা বড় বড় সামন্ত-প্রভুর আওতায় আশ্রয় নিতে। এইসব রাজা বা সামন্ত-প্রভুরা সমস্ত জমি ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করত, আর ব্যারণদেরকে পরিণত করত অমাত্যে। কিন্তু, ছোটখাট ব্যারণদের সংখ্যা যতই কমতে থাকল, নানান দুর্গের মধ্যেকার যুদ্ধও ততই কমে আসতে লাগল। কিছুটা শান্তি ফিরে এল দেশে, সামন্ততান্ত্রিক নিরাপত্তা আর চূড়ান্তরকম প্রয়োজনীয় রইল না। তার ফলে জমিদারদেরও আর সবসময় নিজেদের জমিদারীতে থাকার দরকার রইল না, ডিউকদের দরবারে ও রাজসভায় অংশ নিতে শুরু করল তারা। ওখানে তারা অমাত্য হয়ে উঠল, নিজেদের প্রজা ও পোষ্যদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা আর রইল না তাদের। যেদিন থেকে কৃষকের আর সামরিক সাহায্যের দরকার হল না, সেদিনই বেজে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মৃত্যু-ঘণ্টা। যুদ্ধের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল সামন্ততন্ত্র, যুদ্ধই ধ্বংস করল তাকে। যে বৈশিষ্ট্যগুলি তার অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলে ছিল, সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই ধ্বংস করল তাকে।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন বিদ্যমান ছিল, ততদিন এই ব্যবস্থার জন্মদাতা আদিম সাম্যবাদের নানান লক্ষণও চোখে পড়ত। অবশ্য সামন্তপ্রভুর সঙ্গে তার প্রজা ও পোষ্যদের সম্পর্কে ক্ষেত্রে সমতার কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট ছিল না। সামন্তপ্রভু এবং তার পোষ্যরা আবার সমকক্ষে পরিণত হত সার্বজনীন পরিষদে। এই পরিষদে গ্রামবাসী ও সামন্তপ্রভু, উভয়েরই চাষ-বাস সংক্রান্ত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করত। সামন্তপ্রভুর অনুমতি ছাড়াই এই পরিষদ মিলিত হত, এমনকি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিলিত হত পরিষদ। অবশিষ্ট অধিবাসীদেরই মতই তারও গোষ্ঠীগত অধিকার একইরকমভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সার্বজনীন পশুচারণভূমিতে সে তার কতগুলি পশুকে পাঠাতে পারবে, তা কঠোরভাবে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হত। নর্ম্যাণ্ডির কৃষিজীবি শ্রেণীগুলির বিষয়ে এক কৌতুহলোদ্দীপক গবেষণা চালিয়েছিলেন ডিলাইল্। তিনি এমন

পাট চালানো, আর নারীদের শ্লীলতাহানি করা। দেশ জুড়ে লুঠ-পাট চালানোর জন্য একদল আরাগজীয় রুটিয়ের (routiers) পুষেছিলেন তিনি। জনৈক গীতিকবি তাঁর গানে বলেছিলেন যে বিশপ আর মঠাধ্যক্ষরা ভীষণ অনুরক্ত "সুন্দরী রমণী ও রক্তবর্ণ সুরায়, চমৎকার অশ্ব ও মূল্যবান পোষাকের"। এরা বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকে অথচ আমাদের প্রভু যীশু দারিদ্র্যের মাঝেই তাঁর তৃপ্তি খুঁজে পেতেন।

কিছু রচনার উল্লেখ করেছেন, যা থেকে সামন্তপ্রভুর অধিকারের সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, তৃণভূমিতে চরানোর জন্য মাত্র দুটি বলদ এবং একটি ঘোড়া পাঠানোর অধিকার ছিল সিনর দ্য ব্রিকেভিল্‌-এর। বিশেষ অধিকার বলতে যে তাঁর কিছুই ছিল না, তা বোঝা যায় সামন্তযুগের মহান আইনজ্ঞ ল্যা পোয়া দ্য ফ্রেমেন্‌ভিল্‌-এর লেখা থেকে। "যে সামন্তপ্রভুর নিজের কোন গৃহপালিত পশু নেই তিনি নতুন কোন পশুকে ভাড়া বা লিজ্‌ ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারবেন না অথবা প্রজাসাধারণের কোন পশুকে বিক্রি করতে অথবা ভাড়া খাটাতে পারবেন না।"

চার্চের সম্পত্তিও জমিদারী সম্পত্তির মত একইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। সেই অশান্ত-উত্তাল যুগে নিরাপত্তার জন্য মানুষ যেমন ব্যারনদের দুর্গে আশ্রয় নিত, ঠিক তেমনই আশ্রয় নিত চার্চেও। আর বস্তুত, যাজকীয় ক্ষমতার গুরুত্ব ব্যারনদের ক্ষমতার গুরুত্বের থেকে অনেক বেশিই ছিল। যাজকদের হাতেই থাকত বেহেস্তের চাবিকাঠি। স্বর্গের অঙ্গনে নিজের জন্য একটু জায়গা পাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করার আশায় মৃত্যুপথযাত্রী মানুষরা নিজেদের জিনিসপত্র চার্চের নামে লিখে দিত। শুরুতে এই প্রথাটি ছিল স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু একসময় প্রথাটি একেবারে সার্বজনীন হয়ে উঠল, এবং অবশেষে বাধ্যবাধকতায় পরিণত হল। "নিজের সম্পত্তির একটা অংশ চার্চের নামে লিখে না দিয়ে কোন লোক মারা গেলে তার মৃত্যুকে বলা হত deconfes অবস্থায় মৃত্যু, এবং তার জন্য কোন প্রার্থনা সভা বসত না, এমনকি তাকে কবরও দেওয়া হত না। উইল না করে কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজনদের বিশপের কাছে আবেদন জানাতে হত সালিস নিয়োগ করার জন্য। মৃত ব্যক্তি কোন উইল করে গেলে সেই উইলে কতটা পরিমাণ সম্পত্তি তার দান করা উচিত ছিল, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বসে তা স্থির করত এই সালিসরা।"[১]

১০০০ সালের যুগ-সন্ধিক্ষণে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে—এই ভয় থেকে যাজকদের কাছে ও মঠের তহবিলে আরও বেশি বেশি করে দান করতে শুরু করে লোকেরা। সমস্ত মানুষ আর জীবজন্তু যখন ধ্বংসই হয়ে যাবে, আর শেষ বিচারের দিন আগত প্রায়—তখন আর জমি-জায়গা বা অস্থাবর সম্পত্তি জমিয়ে রেখে

১। মঁতেস্কু, "L'esprit des lois."

লাভটা কী? কিন্তু, কোনরকম মহাপ্লাবন না ঘটিয়েই পার হয়ে গেল সেই ১০০০ সাল। মানুষের মনে আর কোন ভয় রইল না, বরং জীবদ্দশাতেই নিজেদের জিনিসপত্র হাতছাড়া করে ফেলার জন্য এক গভীর অনুতাপবোধ দেখা দিল তাদের মধ্যে। যে সব লোক নিজেদের জিনিসপত্র ফেরৎ চেয়েছিল, তাদেরকে একঘরে করা ও দেবতার অভিসম্পাত বর্ষণের ভয় দেখানো হয়েছিলো। সেই যুগে চার্চের খাতাপত্র ভরে লেখা থাকত নানান অভিসম্পাতবিধি। দাতা ও তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যই এগুলি তৈরী করা হয়েছিল। এখানে একটা অভিশাপের নমুনা দেওয়া হল। অভারনঁ-র নথিপত্রে এই অভিশাপটি হামেশাই চোখে পড়ে। "কোন বিদেশী, বা তোমার কোন আত্মীয়, অথবা তোমার পুত্র বা কন্যা যদি এই দানের ব্যাপারে আপত্তি জানানোর মত নির্বোধ হয়, ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত কোন বস্তুকে যদি তারা দখল করতে চায়—তাহলে তাদের মাথায় যেন বজ্রঘাত হয়, হেরডের মত ভয়ঙ্কর রকম আহত হয় যেন তারা। প্রভু যীশুকে যারা শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই ডাথান, অ্যাবিরাম ও জুডাসের মত তাদেরকে যেন নরকের গভীরে নির্যাতন করা হয়।"[১]

তবে অন্য এমন কিছু জায়গা থেকেও চার্চ সম্পত্তি পেতো, যেগুলি নিয়ে তেমন কোন ঝামেলা হত না। চার্চের কাছ থেকে পার্থিব নিরাপত্তা পাওয়ার বিনিময়ে অনেকেই তাদের সম্পত্তি, এমনকি নিজেদেরকেও তুলে দিত চার্চের হাতে। গেরার্ড বলেছেন, "নিজেকে উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা, নিজেদের দাসদের প্রতি বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের প্রশ্রয়পূর্ণ আচরণ, এবং তাদের ব্যাপারে আইন প্রদত্ত সুবিধাসমূহ—এইগুলিই ছিল স্বেচ্ছাকৃত দাসত্বের বহু প্রকার কাজকর্মের পিছনে প্রধান অনুপ্রেরণাসমূহ।"[২] চার্চ ও মঠের ভূমিদাস এবং ক্রীতদাসরা রাজার দাসদের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। আঘাত, ক্ষয়ক্ষতি বা মৃত্যু ঘটলে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ পেতো তারা। রাজা এবং চার্চই অপরাধীকে অভিযুক্ত করার দায়িত্ব নিত, যদিও আসলে কিন্তু ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটির পরিবারেরই এটা করার কথা।

সামরিক অবরোধ প্রতিহত করার জন্য মঠগুলিকে খুবই সুরক্ষিত করে গড়ে

১। এইচ. এফ. রিভিয়ের তাঁর "Histoire des Institutions de L' Auvergne"-তে এটির উল্লেখ করেছেন। বইটি ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২। বি. গেরার্ড "Polytique de L' Abbe Irminon". বিভাগ ১৪৫.

তোলা হত, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা অস্ত্রধারণে দক্ষ হতেন। হেস্টিংসের যুদ্ধে উভয় পক্ষেই যাজকরা যুদ্ধ করেছিল। হ্যারল্ডের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য উইনচেষ্টারে অবস্থিত হিডার মঠ বারো জন সন্ন্যাসীর একটা দলকে দিয়েছিল। এই বারোজন সন্ন্যাসীই যুদ্ধে প্রাণ হারান। চার্চের উচ্চ পদাধিকারী থাকত সামরিক প্রধানরা, বর্ম পরে যারা তরবারি ধরার জন্য শানিয়ে রেখেছিল নিজেদের ক্রশ আর পাদরির আঙরাখা। কাহোর্স-এর বিশপের মত অনেক বিশপই বন্দনার সময় সশ্রদ্ধচিত্তে বেদীতে সাজিয়ে দিত তাদের শিরস্ত্রাণ, বর্ম, তরবারি এবং লৌহ-দস্তানা। আর্কবিশপ টার্পিন-এর প্রশংসা করে রঁসভ্যালেতে রলাঁ অলিভারকে বলছেন :

> "আর্কবিশপ ছিলেন সে এক দারুণ অশ্বারোহী,
> এই দুনিয়ায় তাঁর সমান আর তো ছিল না কেউ ;
> বর্শা এবং বল্লম—এ দুয়েই সিদ্ধহস্ত তিনি।"

শৌর্যে তাঁর উদ্দীপিত হয়ে,

> "ফরাসীরা উঠল হেঁকে : আহা, প্রচণ্ড এই বীরত্ব ;
> আর্কবিশপের হাতেতেই থাকবে ক্রশ সুরক্ষিত ;
> আহা, ঈশ্বর যদি চার্লসকে দিতেন তাঁর মত আর ক'জন নাইট মাত্র !"

সামন্ততান্ত্রিক যুগে শুধুমাত্র যাজকদের হাতেই থাকত নির্দেশদানের অধিকার। যাজক পল্লীর যে অধিবাসীরা তাদের ভরণ-পোষণ করত, তাদের সেবায় এই অধিকারকে কাজে লাগাত যাজকরা, ঠিক যেমন কাজে লাগাত নিজেদের হাতিয়ারকে। অনেক সময়ই তারা গ্রামবাসী ও অত্যাচারী জমিদারের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করত। যেমন বর্তমান যুগে আয়ার্ল্যাণ্ডের নিম্নপদস্থ যাজকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের সঙ্গে, এই ক্ষেতমজুর ও কৃষকরাই ঐ যাজকদের ভরণ-পোষণ করে। গ্রামীণ ও শহুরে মানুষদের সঙ্গে যাজকদের সুদৃঢ় ঐক্য থাকলে যাজকরা প্রায়শই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক আর মোহগ্রস্ত ধর্মভক্তির ঘোরে জমিদাররা অনেক সময় হয়ত তাদের জমি ও ধন-সম্পদের কিছুটা অংশ কোন চার্চ বা মঠকে দান করে দিত, কিন্তু যখন তারা স্থির মস্তিষ্কে থাকত, তখন সন্ন্যাসী ও যাজকদের সম্পত্তির জন্য তারা লোলুপ হয়ে উঠত এবং প্রথম সুযোগেই তা আত্মসাৎ করত।

সে যুগের রাজারা ও সামরিক প্রধানরা তাদের স্বাধীন প্রজা ও সৈনিকদেরকে পুরস্কার হিসাবে চার্চ ও মঠ দান করত। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বেশ কিছু চার্চ সাধারণ মানুষের দখলে ছিল। ফ্রান্সের রাজারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের 'রাজকীয় অধিকার' (droit de rigale) বজায় রেখেছিলেন। যে সব বিশপ নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতেন, তাঁদের এলাকার যাবতীয় ফসল এই অধিকারবলে রাজার দখলে আসত। বহু ইংরেজী গল্পের নায়ক এবং ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ যাজক অষ্টম হেনরী চার্চের সংস্কার সাধনের জন্য অন্তত ৬৪৫-টি মঠ, ৯০-টি কলেজ, ২৩৭৪-টি ভজনাগার ও পোপের কর্তৃত্বহীন মুক্ত ভজনালয়, এবং ১০০-টি হাসপাতালের ওপর চাপ দিয়ে বার্ষিক ২০০০০০০ লক্ষ রাজস্ব আদায় করেন। এই লুঠের টাকা তিনি তাঁর অমাত্য ও উপপত্নীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আসলে তাঁর সকল পূর্বপুরুষই এরকম লুণ্ঠন চালাতেন, তিনি শুধু একটু ব্যাপক মাত্রায় এই লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন, এই যা।

অভিজাতবর্গ এবং যাজকসম্প্রদায়—এই দুটি শ্রেণী মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই চালিয়েছিল। আর এই দুটি শ্রেণীই নানান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজও করেছিল সে যুগে। এইসব কাজের প্রতিদান হিসাবেই তাদেরকে খাজনা ও ভূমি-শুল্ক দেওয়া হত।

৪

সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের বোঝা সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণদের ওপর গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল। একসময় এই ব্যারণরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল এবং বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের প্রাপ্য খাজনা তখন অভিজাতদের প্রাপ্যে পরিণত হল। এই অভিজাতরা সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে জন্ম নিত। ব্যারণদের প্রাপ্য খাজনা তারা পেতো বটে, কিন্তু যে সব কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে ব্যারণরা ঐ খাজনা পেতো, সে সব কাজ তারা করত না। বুর্জোয়া লেখকরা এদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং সামন্ততন্ত্রের অনুগামীরা প্রবল উৎসাহে এদের পক্ষে দাঁড়ায়। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব ফ্রান্সের বুকে এদেরকে নিশ্চিতভাবেই দমিয়ে দেয়। তার আগের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুর্জোয়া কর্তৃত্ব, হাউস অফ লর্ডস-এর পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল হাউস অফ কমন্‌স্। কিন্তু এই বিপ্লব কিছু কিছু সামন্ততান্ত্রিক অধিকারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। যে

সময় অভিজাত বা ভূসম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি সমস্ত অর্থেই "বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী"-র একটা শাখা মাত্র ছিল, সে সময় ঐ অধিকারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাটা ছিল একান্তই কালবিরুদ্ধ।

সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো, এগুলির রূপান্তরকে চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা—এসব কিছু না করে এই শতাব্দীর আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ববিদ ও উদারপন্থী বুর্জোয়ারা এই ভেবেই খুশি থেকেছেন যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যে কোন ভাবে যুক্ত সব কিছুকে দারুনভাবে নিন্দা করে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের এবং চিন্তার ঔদার্যের প্রমাণ রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু মধ্যযুগের সামাজিক সংগঠনকে বুঝতে হলো যে দায়-দায়িত্বগুলি সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির অস্থাবর রূপ, সেগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা একান্তই প্রয়োজনীয় সব ধরনের সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব পর্যালোচনা করতে বসলে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। এখানে আমি শুধু সেইগুলি নিয়েই আলোচনা করব যেগুলি বুর্জোয়া লেখকদের বিশেষ রকম ক্রুদ্ধ করে তুলেছে, আর দেখাতে চেষ্টা করব যে এগুলিকে বলপূর্বক টিকিয়ে রাখা ও জোরদার করা হয়ে থাকলেও শুরুর সময় এগুলির ব্যাপারে সবারই সম্মতি ছিল।

নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে জমির ভোগ-দখল (Socage)। আমরা আগেই দেখেছি যে কোন বিজেতা কর্তৃক সামরিক প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যারণরা সচরাচর সাধারণ নাগরিকই ছিল, জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসাবেই বিবেচিত হত তারা। আর তার সমমর্যাদাসম্পন্ন বাকি গ্রামবাসীদের তুলনায়, কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করত না সে। জমি ভাগাভাগির সময় অন্যদের মতই সে-ও নিজের ভাগটুকুই শুধু পেতো। অনেক সময় সাধারণ মানুষরা তার জমিতে চাষের কাজ করে দিত। এর কারণ ছিল একটাই—তাকে সাধারণ মানুষদের প্রতিরক্ষার কাজেই পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত থাকার সুযোগ করে দেওয়া। হাক্স্টহউসেন দেখেছিলেন যে রাশিয়ার জমিদাররা কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত 'মির'-এর জমির এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ পেতো। লাক্রক্‌-মঁৎমেলিয়াঁ বলেছেন যে ফ্রান্সে গোষ্ঠীগত জমিতে জমিদারদের জন্য বরাদ্দ জমির পরিমাণ বাসিন্দাদের অধিকারের চরিত্র অনুযায়ী পরিবর্তিত হত। সাধারণ কৃষকরা যখন খাস জঙ্গলকেও ব্যবহার করার অধিকার পেতো, তখন জমিদারের জন্য বরাদ্দ হত গোষ্ঠীগত জমির দুই-তৃতীয়াংশ; আর কৃষকদের যখন শুধু গোষ্ঠীগত জঙ্গলটুকুই ব্যবহার করার অধিকার থাকত, তখন জমিদাররা পেতো ঐ জমির মাত্র এক-

তৃতীয়াংশ।[১] ব্যারণ এবং সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জমিতে চাষ করার মত ভূমিদাসের অভাব দেখা ছিল। তখন তারা তাদের কর্ষণযোগ্য-ভূমি ('en bordeloge') তুলে দিল কৃষক সমবায়ের হাতে, সে যুগের ভাষায় যে কৃষকদের সম্বন্ধে বলা হত, "এরা একই থালা থেকে একই রুটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সকলে মিলে।"[২] তবে স্বাধীন মানুষই হোক বা ভূমিদাসই হোক, প্রত্যেকেই কয়েকদিন করে সামন্তপ্রভুর জমিতে চাষের কাজ করতে অথবা তার ফসল গোলাজাত করতে বাধ্য ছিল।

যেহেতু তখনও পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য শুরু হয়নি, তাই কৃষকদের মত জমিদারদেরও নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিজেদেরই তৈরী করে নিতে হত। সামন্ততান্ত্রিক লোকালয়গুলিতে অস্ত্রশস্ত্র, চাষের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, পোষাক ইত্যাদি তৈরী করার জন্য সব ধরণের কর্মশালা থাকত, এবং কৃষকরা ও তাদের স্ত্রীরা বছরে নির্দিষ্ট কয়েকদিন ঐ কর্মশালায় কাজ করতে বাধ্য ছিল। নারী কর্মীদের পরিচালনা করলেন স্বয়ং জমিদার-গৃহিনী, আর নারীদের এই কর্মশালাগুলিকে বলা হত 'জেনিসিয়া' (geniciae)। মঠগুলিতেও নারীদের জন্য আলাদা কর্মশালা থাকত।[৩] এই কর্মশালাগুলি কিছুদিনের মধ্যেই জমিদার ও

১। লাক্রফ্-মঁৎমেলিয়াঁ, "Du Droit des Communes sur les biens Communaux." প্যারি' ১৮২৫, যে অল্প কয়েকজন ফরাসী লেখক পুঁজি-পতিদের লোলুপতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গোষ্ঠীগত সম্পত্তিকে সমর্থন করার সাহস দেখিয়েছেন—মঁৎমেলিয়াঁ তাদেরই একজন।

২। Bordelage হচ্ছে metayage-এর মতই জমি ভোগ-দখলের এক সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির কর হিসাবে কোন নগদ টাকাকড়ি দেওয়া হয় না, তার বদলে দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ। গোটা সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপ জুড়েই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের বিপ্লব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা টিকে ছিল। নবম শতাব্দীতে সেঁ্য জার্মেঁই দ্য প্রেস-এর মঠের জমিতে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল—লিখেছেন গেরার্ড। মিস্টার এল. গোমে তাঁর "গ্রামীণ জনগোষ্ঠী" গ্রন্থে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডে একই ধরণের কৃষি ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।

৩। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট এবেরহার্ড মেরব্যাশ্-এর মঠকে কিছু জিনিসপত্র দান করেছিলেন। তারমধ্যে জেনীসিয়ার কাজে নিযুক্ত ৪০ জন কর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তার অনুচরদের হারেমে পরিণত হল, হয়ে উঠল লাম্পট্যের আস্তানা, এইসব জায়গায় জমিদার ও যাজকরা তাদের ভূমিদাসী ও ক্রীতদাসীদের নিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হত।' 'জেনিসিয়ারিয়া' শব্দটি (জেনিসিয়া কর্মরতা নারী) গণিকার সমার্থক হয়ে ওঠে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক পতিতালয়গুলির একটা ধর্মীয় ও অভিজাত জন্ম-ইতিহাস আছে।

প্রথমদিকে, জমিদারের হয়ে তার প্রজাদের কাজ করে দেওয়ার ব্যাপারে দিন-সংখ্যাটার তেমন কোন মূল্য ছিল না। কোথাও কোথাও বছরে তিন দিন কাজ করলেই চলত।[১] ফ্রান্সের রাজকীয় নির্দেশে বলা হয়েছিল কেউ কোন চুক্তি প্রথা অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে তাকে বছরে বারো দিন কাজ করে দিতে হবে। অবশ্য ভূমিদাসদের অনেক বেশি কাজ করতে হত। কিন্তু কখনই সপ্তাহে তিন দিনের বেশী নয়। ভূমিদাসরা জমিদারের দেওয়া ছোট একটা জমি ভোগ-দখল করত, আর এই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা যেত না। জমিদারের ফসলের একটা অংশও ভূমিদাসরা পেতো, এবং বনভূমিতে ও কর্ষনযোগ্য জমিতে পশুচারণেরও অধিকার ছিল তাদের। ১৮২১ সালে প্রকাশিত প্রজা সংক্রান্ত রচনায় অষ্টাদশ লুই-এর কৃষিমন্ত্রী কাউন্ট গ্যাসপারিন 'নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে জমির ভোগদখল' এই ব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির মালিকদের তুলনায় metayage ব্যবস্থার ভূ-সম্পত্তির মালিকদের উৎকর্ষতার কথা বলেছেন। কিন্তু, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময় সামন্তপ্রভুরা নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে জমির ভোগ দখল বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের জনৈক লেখক জাঁ শেহু লিখেছেন, "তারা এত বিপুল কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেছিলেন যে তাই দিয়ে তারা চাষের কাজের জন্য মানুষের কাছ থেকে শ্রম নিঙড়ে আদায় করে নিত, কেড়ে নিত তাদের আঙুরের সঞ্চয়, করিয়ে নিত আরও হাজারো কাজ। আর তার বদলে কৃষকদের বরাতে জুটতো স্রেফ ঐ সামন্তপ্রভুর সশস্ত্র বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার বা নিহত হওয়ার আতঙ্ক।" চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপের গ্রামাঞ্চলগুলিতে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে এসেছিল, আর তখনই সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সমস্ত

১। স্বাধীন মানুষরা তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করুক, এবং বছরে তিন বার করে কাউন্টের হয়ে কাজ করে দিক"—বিগোর-এর রীতিমালায় এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

ধরণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ভার। সেই সময় জমিদারদের উত্তরসূরী অভিজাতরা ক্ষমতায় এল, পরিণত হল পরগাছায় এবং অবতীর্ণ হল অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায়।

ফসল তোলার সময়-ঘোষণা (BANS DE MOISSON)। জমির ঘাস কাটা, আঙুর পাড়া, ফসল তোলা ইত্যাদির দিন-ক্ষণ স্থির করার ব্যাপারে জমিদারের যে অধিকার ছিল, সেটা পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক অধিকার। আমরা দেখেছি যে কর্ষণযোগ্য জমিতে গ্রামের গরু-ছাগল চড়ানোর সুযোগ রাখার জন্য বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা বিভিন্ন চাষের দিন-ক্ষণ স্থির করে দিতেন। গ্রামবাসীদের স্বার্থেই এই রীতির প্রচলন হয়েছিল। জমিদাররা যখন থেকে তাদের ফসলের কেনা-বেচা শুরু করল, তখন থেকেই এই রীতিটি লক্ষ্যচ্যুত হল। বর্ষীয়ানদের পরিষদের জায়গায় জমিদাররা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল, অথবা ঐ পরিষদের সিদ্ধান্তকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে লাগল, যাতে করে ফসল তোলার সময়-ঘোষণাকে বিলম্বিত করা যায় এবং নিজের ফসলটুকু আগেই-ভাগেই তুলে নেওয়া যায়। আর এর ফলে সার্বজনীন জমির ফসল বিক্রির আগেই এবং অন্য সবার ফসলের থেকে ভাল দামেই তারা নিজেদের ফসল বিক্রি করতে পারত।

এজমালি (BANALITE)।[১] শব্দটা সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু এই শব্দ দিয়ে যে প্রথাকে চিহ্নিত করা হয়, তা এক সাম্যবাদী প্রথা। আমরা আগেই দেখছি যে গ্রাম-যৌথগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য কিছু লোককে নিয়োগ করা হত, আর তাদের ভরণ-পোষণ করত গোষ্ঠীর সকলে মিলে। গ্রামে একজন পশুপালক থাকত, যার কাজ ছিল গ্রামের সমস্ত পশুগুলিকে তৃণ-ভূমিতে চরাতে নিয়ে যাওয়া। গোষ্ঠীর পরিচালনায় সার্বজনীন কামারশালা, জাঁতা, কসাইখানা থাকত, থাকত স্ত্রী-পশুর গর্ভে নতুন শাবক উৎপাদনের জন্য সার্বজনীন পুরুষ-পশুর দল। পরিবারগুলি নিজেদের রুটি নিজেরা বানাতো না, পাঠিয়ে দিত সার্বজনীন চুল্লিতে। জ্বালানী খরচ কমানোর আর্থনৈতিক দিকটার কথা ভেবেই এই প্রথা চালু করা হয়েছিল। এইসব চুল্লির তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হত বর্ষীয়ানদের পরিষদের ওপর। পরবর্তীকালে এই দায়িত্ব জমিদারদের উপর বর্তাই। আর নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যখনই প্রয়োজন হত, তখনই জমিদাররা গোষ্ঠি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্তৃত্বের জায়গায় খাড়া

১। বুচার দ্যাগিস 'গ্রামীণ সংহিতা'। ১৫ পরিচ্ছেদ। Des banalites.

করত নিজেদের কর্তৃত্ব। সার্বজনীন জিনিসপত্র ব্যবহারের এই অধিকারের জন্য অল্প কিছু কর ধার্য করা হত। রাইম্‌-এর আর্কবিশপ গিলস্‌ ব্রাঁস্যেঁ ১২২৩ সালের এক আদেশে বলেছিলেন যে "সার্বজনীন চুল্লি যাজকদের অধিকারে থাকবে, আর প্রতি বত্রিশটা রুটির মধ্যে একটা করে রুটি তারা পাবে কর হিসাবে।" বুচার হ্যার্গিস ১৫৬৩ এবং ১৬৭৩ সালের দুটি হুকুমনামার উল্লেখ করেছেন। এই হুকুমনামা দুটিতে সার্বজনীন শস্য পেষাইকলে যথাক্রমে ষোলভাগের একভাগ এবং তেরো ভাগের এক ভাগ পেষাইকর হিসাবে ধার্য করা হয়েছিল। হিসাব করে দেখা গেছে যে বর্তমানে পেষাইকলওয়ালারা এক-দশমাংশেরও বেশি এর জন্যে আদায় করে।[১]

পণ্য উৎপাদনের অনুপস্থিতির ফলেই এই ধরনের ব্যবস্থা টিকে থাকতে পেরেছিল। এগুলি ব্যবসা বানিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করত এবং ব্যক্তিগত শিল্পের পথে বাধা সৃষ্টি করত। ফ্রান্সের বিপ্লবী বুর্জোয়ারা এগুলিকে সামন্ততন্ত্রের কলঙ্কযুক্ত ব্যাপার বলে ঘোষণা করে এবং ১৮৭০ সালে এগুলির বিলোপ ঘটায়।

চার্চগুলি এক সময় যাজকদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং শুধু উপাসনার সময়টুকু বাদে অন্য সময় চার্চে আর জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে না। কিন্তু তার আগে এই চার্চগুলি ছিল যাজক, জমিদার ও কৃষকদের যৌথ সম্পত্তি। চার্চের পূর্বাংশ ও বেদি ছিল জমিদার ও যাজকদের অধিকারভুক্ত। এর কাঠের জিনিসপত্র, মেঝে, বসার জায়গা প্রভৃতি মেরামত করাতে তারা বাধ্য ছিল। কিন্তু চার্চের মূল অংশটা থাকত কৃষকদের অধিকারে। বাজার, গোষ্ঠীগত জমায়েত, নাচের আসর, এমনকি প্রয়োজনবোধে ফসল রাখার গোলা হিসাবে চার্চের ঐ মূল অংশটাকে ব্যবহার করত তারা।[২] মিস্টার

১। এর অর্থ হল কোন কিছু পাওয়ার জন্য জমিদারের জিনিসের বাধ্যতামূলক ব্যবহার।

২। ১৫২৯ সালের একটি যাজকীয় বিচারসভার বিধিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে "চার্চ বা এখানকার কবরখানায় কোন উৎসব, নাচ, ক্রীড়া, আনন্দ-ফূর্তি, কেনা-বেচার বাজার বা অন্যান্য অবৈধ জমায়েত করা চলবে না। কেননা চার্চ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবার কাজেই নিয়োজিত, তাই এইসব পাপ কাজে সে হতে পারে না।" মধ্যযুগের সরল সাদাসিধে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাসগৃহে নাচাকে এবং নিজেদের অলৌকিক কাহিনীমূলক নাট্য প্রদর্শনকে কোন অন্যায় কাজ বলে মনে করতে পারে নি।

থোরোল্ড রজার্স বলেছেন যে চার্চগুলি সর্বদাই ব্যবহৃত হত যাজক-পল্লীর অধিবাসীদের সার্বজনীন বৈঠকখানা এবং বিপদের সময় দুর্গ হিসাবে, আর ঐ অঞ্চলের প্রথম বসবাসকারীরা যে জমিটাকে প্রাচীরবেষ্টিত করে গড়ে তোলে, সাধারণত সেই জমিতেই তৈরী হত চার্চগুলি।[৩] চার্চের ঘণ্টাগুলিও থাকত কৃষকদের অধিকারে। এই ঘণ্টা বাজিয়ে জমায়েতের ঘোষণা করা হত, অথবা কোথাও আগুন লাগা বা শত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সঙ্কেত জানানো হত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী প্রদেশগুলির বিচারবিভাগীয় মহাফেজখানার দলিলপত্রে প্রায়শই দেখা যায়—লবণ কর আদায়কারীর আগমন সম্বন্ধে কৃষকদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ঘণ্টা বাজানোর বিরুদ্ধে নানান রায় দেওয়া হয়েছে। এইসব অপরাধীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত এবং জল্লাদরা তাদের চাবুক দিয়ে মারত,—"যদিও এক অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে তারা নিয়োজিত এবং ঐ অনুষ্ঠানের তারা আশির্বাদধন্য, যে অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত সেণ্ট ক্রীস্‌ম্‌-এর তেল আর ধূপ-ধুনো এবং উচ্চারিত হত নানান প্রার্থনা।" চার্চ ছিল ঈশ্বরের বাসগৃহ। চার্চগুলি তৈরী করা হত জমিদারের বাড়ির সামনে। চার্চের প্রাঙ্গণে জমায়েত হত কৃষকরা, যেমনভাবে কোন শক্তিময়ী, স্নেহময়ী জননীর চারপাশে জমায়েত হয় তার সন্তানরা।

কৃষকদের ও অভিজাতদের ফসল থেকে খাজনা হিসাবে এক-দশমাংশ নিত চার্চ। প্রথম দিকে এই খাজনা দেওয়াটা ছিল ঐচ্ছিক ব্যাপার, যেমন বর্তমান আয়ার্ল্যাণ্ডে এই খাজনা একান্তই ঐচ্ছিক। যাজক এবং জাদুকর—উভয়কেই ঐ খাজনা দেওয়া হত। নবম শতাব্দীর জনৈক আর্কবিশপ অ্যাগোবার্ড অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে লোকে 'টেম্‌পেস্টারী'-দেরকে যত নিয়মিতভাবে খাজনা দেয়, তত নিয়মিতভাবে চার্চের খাজনা দেয় না (যে সব লোক ঝড় থামাতে পারে, খারাপ আবহাওয়াকে পাল্টে দিতে পারে বলে মনে করা হত, তাদেরকেই বলা হত 'টেম্‌পেস্টারী')। কিন্তু এই ঐচ্ছিক খাজনা একসময় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। একটা চালু সামন্ততান্ত্রিক প্রবচনে বলা হয়েছে, "জমি মানেই দায়-দায়িত্ব।" খাজনা পাওয়াটা এক সামন্ততান্ত্রিক অধিকারে পরিণত হয়েছিল। এই অধিকার পেয়েছিল জমিদার ও মঠাধ্যক্ষরা। পরে তারা আবার জমি বিক্রি করে দেয় অন্যান্য সাধারণ লোকের কাছে। প্রথমে খাজনা ছিল স্বেচ্ছাধীন, পরে হয়ে উঠল বাধ্যতামূলক। আর, পরবর্তীকালে এই খাজনা এক গুরুভার

৩। থোরোল্ড রজার্স, "ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা।"

শুল্কে পরিণত হল, যে শুল্ক এতদিন পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। যেন পরিশুদ্ধ সোনা পরিবর্তিত হল দূষিত তামায়!

৫

সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা যখন তাদের পোষ্য, প্রজা ও ভূমিদাসদের জন্য আর পালন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত না, তখন জমিদারদের প্রতি প্রজাদের বাধ্য-বাধকতা এক গুরুভার ও অবিচারমূলক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, অথচ এই বাধ্যবাধকতাকেই তাঁরা এক সময় স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল। একইভাবে, অভিজাতদের স্থাবর সম্পত্তি—যেগুলি প্রথমে ছিল সামরিক আস্তানা, কোন যোদ্ধাকে যা সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হত অথবা ভূমিবণ্টনের সময় শুধু একটা ভাগ পাওয়ার অধিকার হিসাবেই যা বিবেচিত হত—তাদের বিভিন্ন কায়দায় প্রতারণা ও হিংস্র অত্যাচারের সাহায্যে ক্রমশ বেড়েই চলল। গোষ্ঠিগত জমিকে গ্রাস করেই সাধারণত তাঁদের জমির পরিধি বিস্তৃততর হয়েছিল।
"ক্যাপিটাল"-এর "কৃষিজীবি মানুষদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গে" শীর্ষক চমৎকার সেই ২৭-তম পরিচ্ছেদে (পাঠকদের ঐ পরিচ্ছেদটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি) মার্কস বর্ণনা করেছেন কত দ্রুত ও নির্মমভাবে স্কচ্ ও ইংরেজ জমিদাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল। "হলিন্‌শেড'স্ ক্রনিকল্"-এর সম্পাদক হ্যারিসন এদেরকে "কুখ্যাত গ্রাসকারী" নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই গ্রাসকারীরা দ্রুতগতিতে কাজ করে চলল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যার ব্যাপকতম অংশ ছিল কৃষক ভূমধ্যিকারী, আর এই সামন্ততান্ত্রিক স্বত্বের আড়ালেই তাদের সম্পত্তির অধিকারকে গোপন করে রাখা হত। মেকলের হিসাব মতো "ভূম্যধিকারীদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এই ভূম্যধিকারীদের পরিবারের লোকজনকে হিসাব করলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় সারা দেশের জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশেরও অধিক। এইসব ক্ষুদ্র জমিদারদের গড় আয় ছিল বছরে ৬০ থেকে ৭০ পাউণ্ড।"
উচ্ছেদের আসল যুগটা শুরু হল ষোড়শ শতাব্দীতে। বড় বড় সামন্তপ্রভুরা বলপ্রয়োগ করে কৃষকদের হটিয়ে দিল জমি থেকে, যে জমিতে জমিদারদের মতই কৃষকদেরও সমান সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ছিল। কৃষকদের হটিয়ে দিয়ে গোষ্ঠীগত জমিগুলি দখল করে নিল জমিদাররা। ফ্লেমিনা পশম তৈরীর দ্রুত উন্নতি, আর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডে পশমের দাম বৃদ্ধি পাওয়া—এগুলি ঐসব উচ্ছেদের পিছনে এক প্রত্যক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। মানুষকে তাড়িয়ে দিল

ভেড়ার দল। টমাস মোর বলেছেন, "যে ভেড়ারা ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, শান্তশিষ্ট এবং স্বল্পভোজী, তারা এখন এত ক্ষুধার্ত ও হিংস্র হয়ে উঠল যে মানুষগুলিকেই গোগ্রাসে গিলে সাফ করেছিল।"[১]

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে ইওম্যান্‌রি অর্থাৎ স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা গোষ্ঠীবদ্ধ চাষীদের থেকে অনেক বেশী ছিল। এরাই ছিল ক্রমওয়েলের শক্তির মেরুদণ্ড। আর, মেকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এই ইওম্যান্‌রিরা মাতাল জমিদার ও তাদের অনুগৃহীত দাসদের এবং গ্রাম্য যাজকদের বিরুদ্ধে ছিল, যে যাজকরা তাদের প্রভুদের পরিত্যক্তা রক্ষিতাদের বিবাহ করতে বাধ্য হত। ১৭৫০ সাল নাগাদ ইওম্যান্‌রিরা বিলুপ্ত হয় সেই সঙ্গেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে বিলুপ্ত হয় কৃষি-শ্রমিকদের সার্বজনীন জমির শেষ চিহ্নটুকুও। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে কৃষি-শ্রমিক ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তির মধ্যেকার সম্পর্কের যোগ-সূত্রের স্মৃতিটুকুও মুছে গেছে। জমিদাররাই জমিদারদের যে সংসদীয় যন্ত্রটি উপহার দিয়েছিল, তার সাহায্যে ১৮০০ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে কৃষিজীবি মানুষদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ৩৫১১৭৭০ একর সাধারণ জমি, আর তার জন্য তাদেরকে এক কানাকড়িও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

জমি থেকে কৃষিজীবি মানুষদের পাইকারি হারে উচ্ছেদের সর্বশেষ প্রক্রিয়াটা হল তথাকথিত সম্পত্তি সাফাই, অর্থাৎ জমি থেকে ঐ মানুষদের উচ্ছেদ করণ। কিন্তু "সম্পত্তি সাফাই" বলতে সঠিক কী বোঝায়, তা আমরা দেখতে পাই আধুনিক রোমান্সের সেই স্বপ্নময় দেশে, অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানে ঐ প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সুসম্বদ্ধ চরিত্র, এবং এর প্রয়োগের মাত্রা, যা একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করত (আয়ার্ল্যাণ্ডে জমিদাররা বেশ কিছু গ্রাম থেকে একসঙ্গে কৃষকদের উচ্ছেদ করেছে; স্কটল্যাণ্ডে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে জার্মান রাজ্যগুলির মত বড় বড় এলাকা জুড়ে), এবং অবশেষে, আত্মসাৎ করা জমিগুলি সম্পত্তির যে বিশিষ্ট রূপটি পরিগ্রহ করেছিল। পার্বত্যাঞ্চলের কেল্টরা বিভিন্ন বিভক্ত ছিল গোত্রে। একেকটি গোত্র একেকটি জমিতে বসবাস করত এবং সেই জমির মালিক ছিল তারাই। গোত্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ মোড়ল বা প্রধান-রা ঐ সম্পত্তির শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে মালিক ছিল, ঠিক যেমন ইংল্যাণ্ডের রাণী নাম-কা-ওয়াস্তে সমগ্র দেশের মালকিন। ইংরেজ সরকার যখন এইসব প্রধান-দের ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে

---

১. "ইউটোপিয়া", রবিনসন কর্তৃক অনূদিত। সংস্করণ—আর্বার, লণ্ডন, ১৮৯৬.

দমন করতে ও নিম্নাঞ্চলের সমতলভূমিতে তাদের অবিরাম আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হল, তখন কিন্তু ঐসব গোষ্ঠীগত মোড়লরা তাদের সুপ্রাচীন সম্মান-জনক ডাকাতির পেশাকে পরিত্যাগ না করে শুধু তার কায়দাকে পাল্টেছিল। নিজেদের কর্তৃত্বের জোরে তারা তাদের নামমাত্র অধিকারকে রূপান্তরিত করেছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে। এর ফলে গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সংঘাত বাধলো তাদের। মোড়লরা তখন তাদেরকে সরাসরি বলপ্রয়োগের সাহায্যে বিতাড়িত করার পথ ধরলো। অধ্যাপক নিউম্যান্ বলেছেন, "ইংল্যাণ্ডের কোন রাজাও হয়ত একইভাবে তার প্রজাদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।" 'সিংহাসন-দাবীদার'-এর (Pritender) অনুগামীদের শেষ অভ্যুত্থানের পর স্কটল্যাণ্ডে শুরু হয়েছিল এই বিপ্লব। স্যার জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট ও জেম্‌স্ অ্যাণ্ডারসন-এর রচনায় এই বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার উদাহরণ হিসাবে সুদারল্যাণ্ডের ডাচেস্ যে "সাফাই" অভিযান চালিয়েছিলেন, তার কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। এই ডাচেস্‌টি অর্থনীতিতে সুশিক্ষিতা ছিলেন। সরকারী ক্ষমতায় এসেই তিনি এক আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কার্যক্রমে এবং গোটা দেশটাকে মেষচারণের এলাকায় পরিণত করার নানান প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেশটির জনসংখ্যা তখনই ১৫ হাজারে নেমে এসেছিল। এই ১৫ হাজার বাসিন্দাকে, অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে, ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে খুঁজে খুঁজে বার করে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের সবকটা গ্রাম ধ্বংস করা হয়, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রামগুলিকে, এবং তাদের জমিগুলি পরিণত হয় চারণভূমিতে। ব্রিটিশ সৈন্যরা বলপ্রয়োগ করে এই উচ্ছেদ চালায়, এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। নিজের কুটির ছেড়ে যেতে রাজি হননি এক বৃদ্ধা। কুটিরটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, আর সেই আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান বৃদ্ধাটি। এইভাবে ঐ ডাচেস মহিলাটি ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমি অধিকার করেন, যে জমি স্মরণাতীত কাল থেকেই গোষ্ঠীগুলির সম্পত্তি ছিল। বিতাড়িত বাসিন্দাদের জন্য তিনি সমুদ্রের তীরে ৬ হাজার একর জমি বরাদ্দ করেন, অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু ২ একর করে। এই ৬ হাজার একর জমি এতদিন পর্যন্ত পতিত জমি হয়েই পড়েছিল, ঐ জমি থেকে মালিকদের কোন আয়ই হত না। ডাচেস্‌টির হৃদয় বড় উদার! একর পিছু গড়ে ২ শিলিং ৬ পেন্স খাজনাতেই তিনি গোষ্ঠী মানুষদের ঐসব জমি দিয়ে দেন। এইসব মানুষরাই শতশত বছর ধরে তাঁর পরিবারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে

রক্ত ঝরিয়েছিল। গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া গোটা জমিটাকে তিনি ২৯-টা বড় বড় মেষপালক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেন। এক একটা পরিবার এই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক। নিজেদের কাজের জন্য তারা মূলত ইংরেজ পশুপালকদের আমদানী করেছিল। ১৮৩৫ সালে গেইল জাতির ১৫ হাজার মানুষের জায়গা নেয় ১ লক্ষ ২১ হাজার ভেড়া। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া এই আদিবাসীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতে থাকে। এরা ক্রমশঃ উভচর প্রাণীতে পরিণত হয়। জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন— এরা বাস করত অর্ধেক সময় ডাঙায় আর অর্ধেক সময় জলে, জলে ডাঙায় ভাগাভাগি করে কেটে যেত এদের জীবন।

রাষ্ট্রীয় জমিকে ব্যাপক মাত্রায় কেড়ে নেওয়া শুরু হয় উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ-এর আমলে। "এইসব তালুকগুলি বিতরণ করে দেওয়া হত, অত্যল্প দামে বিক্রি করা হত বা এমনকি কখনো কখনো সরাসরি দখল করে নিয়ে কারো ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আইনগত শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই এইসব কাজ করা হত। এইভাবে প্রতারণার মাধ্যমেই পুঞ্জীভূত হয়েছিল রাজকীয় ভূ-সম্পদ, আর তার সঙ্গে ছিল চার্চের সম্পত্তি লুণ্ঠন। প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এই সম্পত্তি আবার তাদের হাতছাড়া হয়। কিন্তু এই ভূ-সম্পদই ইংরেজ শাসকদের বর্তমান রাজত্বের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা নানান কারণে এইসব কাজকে সমর্থন করেছিল। এইসব কারণের মধ্যে ছিল—স্থলভাগে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, বৃহদায়তন খামার ব্যবস্থায় আধুনিক কৃষির ক্ষেত্র প্রসারিত করা, এবং হাতের কাজের জন্য স্বাধীন কৃষিজীবি মজুরদের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।"

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর স্থাবর সম্পত্তির মালিকরা আইনী উপায়ে বহুজনের জমি জায়গা দখল করতে শুরু করে। এবং মহাদেশের সর্বত্র এই দখলদারি ছড়িয়ে পড়ে, আর তার জন্য কোন রকম আইনী রীতিনীতির ধার ধারা হয় না। ১৬৬০ সালে হাউস অফ কমন্স যাতে জমিদাররাই সর্বেসর্বা ছিল— নিজেদের ভূ-সম্পত্তির জন্য প্রদেয় যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক খাজনাপত্র বাতিল করে দেয়, যে খাজনার পরিমাণ সে সময় ছিল রাষ্ট্রের মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক। সামরিক কাজকর্ম, খাদ্যসরবরাহ, সাহায্য, ত্রাণ, সরকারী মালিকানা, তত্ত্বাবধান, মালিকানা হস্তান্তর, বাজেয়াপ্তকরণ—সবকিছু তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তার জায়গায় চালু হল অন্তঃশুল্ক। দ্বিতীয় চার্লসের দ্বাদশ আইনের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের ধারা মতে করের বিপুল বোঝাটা এই প্রথম জমির

বদলে মানুষের ওপর চাপানো হয়, আর তারপর থেকেই সাধারণ মানুষরা ঐ করের বোঝা বহন করে চলেছে।

জমিদাররা যে সব স্থাবর সম্পত্তিকে একচেটিয়া করে নিয়েছিল,' রাষ্ট্রের কাছে প্রদেয় যাবতীয় খাজনা থেকে সেগুলিকে রেহাই দেওয়া হল, আর জমিদারদের রেহাই দেওয়া হল তাদের দান ও প্রজাদের প্রতি পালনীয় যাবতীয় বাধ্যবাধকতা থেকে অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি রূপান্তরিত হল পুঁজিবাদী সম্পত্তিতে।

গ্রেট ব্রিটেনে এই রূপান্তর সাধিত হয়েছিল কৃষকশ্রেণীর উপর চূড়ান্ত দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়ার মারফৎ। চাষীদের পাইকারি হারে জমি থেকে উৎখাত করে ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যা ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া চাষী এক সামাজিক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অত্যন্ত বর্বরোচিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। আইনে তাদেরকে "স্বেচ্ছাকৃত" অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, আর বলা হয় যে পুরনো অবস্থায় কাজ করে যাওয়াটা তাদেরই স্বইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। অথচ বাস্তবে ঐ পুরনো অবস্থার আর কোন অস্তিত্বই তখন আর ছিল না। ইংল্যাণ্ডে এই আইন বলবৎ হয় সপ্তম হেন্‌রির আমলে।

অষ্টম হেন্‌রি, ১৫৩০ : "বৃদ্ধ এবং অক্ষম ভিক্ষুকদের একটা ভিক্ষার অনুমতি পত্র দেওয়া হয়। অন্যদিকে, শক্তসমর্থ ভবঘুরেদের বরাতে জোটে বেত্রাঘাত ও কারাদণ্ড। তাদেরকে একটা গোরুর গাড়ির পেছনে বেঁধে ক্রমাগত চাবুক মারা হয়, যতক্ষণ না তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের স্রোত। তারপর তাদেরকে শপথ নিতে হয় যে তারা নিজেদের জন্মস্থানে, অথবা বিগত তিন বছর যেখানে বসবাস করেছে, সেইখানে ফিরে যাবে এবং কাজ করতে শুরু করবে।" কী নিদারুণ পরিহাস! অষ্টম হেন্‌রির ২৭ তম আইনে পূর্ববর্তী বিধানটিরই পুনরাবৃত্তি করা হলেও নতুন নতুন ধারা ঢুকিয়ে এটিকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলা হয়েছে। "ভবঘুরে বৃত্তির জন্য দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে অপরাধীকে আবার চাবুক মারা হবে এবং তার আধখানা কান কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু তৃতীয়বার ধরা পড়লে দাগী অপরাধী এবং জনসাধারণের শত্রু হিসাবে তার প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে।"

এলিজাবেথ, ১৫৭২ : ১৪ বছরের থেকে বেশি যাদের বয়স, এমন সমস্ত অনুমতি পত্র-হীন ভিক্ষুকদের প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করা হবে এবং তাদের বাঁ কানে ছ্যাকা দিয়ে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দেওয়া হবে, যদি না কেউ তাদেরকে দু'বছরের জন্য

কাজে নিয়োগ করে। দ্বিতীয়বার আবার ঐ অপরাধ করলে এবং তাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে, যদি না কেউ তাদেরকে দু'বছরের জন্য কাজে নিয়োগ করে। কিন্তু তৃতীয়বার একই অপরাধ করলে কোনরকম দয়া না করে দুর্বৃত্ত হিসাবে তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবেই। একইরকম বিধান দেখা যায় এলিজাবেথের অষ্টাদশ আইনের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, এবং প্রথম জেমস্-এর ১৫৯৭ সালের আইনে।—যারা ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ও ভিক্ষা করবে, তাদেরকে দুর্বৃত্ত ও ভবঘুরে হিসাবে ঘোষণা করা যবে। বিচারকরা ছোটখাট বিচারে তাদেরকে প্রকাশ্যে চাবুক মারার আদেশ দিতে পারেন। প্রথমবার ঐ অপরাধ করলে দিতে পারেন ছয় মাসের কারাদণ্ড, দ্বিতীয়বার দু'বছর। তারা কারাগারে থাকার সময় বিচারকরা যতবার প্রয়োজন বলে মনে করবেন, ততবারই তাদেরকে চাবুক মারা হবে। অসংশোধনীয় ও বিপজ্জনক দুর্বৃত্তদের বাঁ কাঁধে ছ্যাঁকা দিয়ে কলঙ্ক চিহ্ন হিসাবে "R" অক্ষরটি দেগে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা হবে। তারপরেও আবার ভিক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়লে কোনরকম দয়া-মায়া না দেখিয়ে তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। এই বিধানগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল। অ্যান্-এর দ্বাদশ আইনের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এগুলিকে বাতিল করা হয়।

যদিও ইওরোপের কোন রাষ্ট্রই এমন কোন অভিজাততন্ত্রের জন্ম দিতে পারেনি যারা স্কচ্ ও ইংরেজ জমিদারদের মত ব্যগ্র ও হিংস্রভাবে সমস্ত জমিকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করে নিতে পেরেছে, তবুও, সমস্ত দেশেই, কৃষকশ্রেণীর ভূ-সম্পত্তির অধিকাংশই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এবং সবটুকু গ্রাস করে নেওয়ার সেই পরম সম্মানজনক ও লাভজনক কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে। একাজের জন্য ফ্রান্সে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তার কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা যাক।

সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা, সাহায্য তহবিলে প্রদেয় অর্থ ও জরিমানার পরিমাণ এত অতিরিক্ত হয়ে উঠেছিল যে কৃষকরা সার্বজনীন জমির একটা অংশ জমিদারকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইত। এইভাবে বিভিন্ন এলাকা পাওয়ার জন্য একান্ত লুব্ধ হয়ে থাকত জমিদাররা, আর নানান ধূর্ত কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এগুলিকে দখল করা তাদের কারুর কাছেই কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। অভিজাতরা কয়েকজন গ্রামবাসীকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করত। এই গ্রামবাসীরা নিজেদের লোকদের নিয়ে ঐ অঞ্চলের সাধারণ পরিষদ গঠন করত,

তারপর এই পরিষদ জমিদারের হাতে এলাকাটি সমর্পণের পক্ষে মত দিত। এইরকম সমর্পণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফ্রান্সে নানান রাজকীয় আদেশ জারি করা হয়। এইসব আদেশে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে কোন এলাকা সমর্পণ তখনই বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন এই সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর সাধারণ সভা থেকে।

গোষ্ঠীগত জমির লুঠেরারা সবসময় কিন্তু ভণ্ডামির সাহায্য নেয়নি। প্রায়শই তারা একেবারে খোলাখুলি বর্বরসুলভ পদ্ধতির সাহায্যেই জমি লুঠ করত। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রমশিল্পীয় ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল, তখন অভিজাতবর্গ ও বুর্জোয়া ফাট্‌কাবাজরা গোষ্ঠীগত জমি গ্রাস করার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিল। নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য শহরগুলিকে সম্প্রসারিত করা হয় ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষির এই বিকাশকে দারুণভাবেই কাজে লাগায় ফাট্‌কাবাজরা। কর্ষণযোগ্য জমিকে আরও বিস্তৃত করার অজুহাত দেখিয়ে পতিত জমিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আসার অধিকার তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে রাজাকে তারা রাজি করায় একটি রাজকীয় অনুশাসন জারি করতে। গোষ্ঠীগত জমিকে পতিত জমি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য তারা উঠে-পড়ে লাগে, এবং কৃষকদের কাছ থেকে ঐ গোষ্ঠীগত জমিগুলি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। জমি রক্ষার জন্য কৃষকরা অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ায়। তাদের এই প্রতিরোধ ভাঙার জন্য রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে বাধ্য হয় ফাট্‌কাবাজরা।

গ্রামীন এলাকাগুলি দখল করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেয় অভিজাতরা। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে যে কৃষকদের মালিকানায় যে জমিগুলি আছে, সেগুলি তাদের স্বত্বমূলক দলিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এইসব দলিলে কিছু গণ্ডগোল অবশ্য ছিলোই! নিজেদের দাবী যাচাই করে দেখার জন্য চাপ দেয় অভিজাতরা। যাচাইয়ের ফলে যে সব জমির দলিলে ভুল-চুক ধরা পড়ে, সেই জমিগুলিকে তারা নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কখনও কখনও তারা এক বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। স্বত্বমূলক যে দলিলগুলি তারা পেয়েছিল, সেগুলিকে তারা নিজেরাই নষ্ট করে ফেলে। ফলে ঐ জমিগুলি মালিকানাহীন হয়ে পড়ে, এবং ঐসব জমিতে নিজেদের অধিকার প্রমাণ করার আর কোন সুযোগই থাকে না কৃষকদের আর তখন, "যে জমির মালিক নেই, সে জমি অভিজাতদের" (Pas de terre sans seigneur)—এই সামন্ততান্ত্রিক প্রবচন অনুযায়ী কৃষকদের জমিগুলি দখল করে নেয় অভিজাতরা।

১৭৮৯ সালের বিপ্লবের সময় কৃষকরা মালিকানা স্বত্বের যে (autos da fe´) অধিকার আদায় করেছিল, তা ছিল ষোড়শ শতাব্দীতে অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক কৃষকদের স্বত্ব কেড়ে নেওয়ারই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা।

অরণ্যগুলিকে অভিজাতরা দখল করে নিয়েছিল আরও নির্মমভাবে। কোনরকম আইনী আনুষ্ঠানিকতার পরোয়া না করেই জমিদাররা বনভূমি ও নিম্ন-বনাঞ্চল-গুলির মালিকানা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। বনভূমির চারপাশে বেড়া দেয় তারা, শিকার নিষিদ্ধ করে দেয় এবং কাঠকাটার অধিকারও নাকচ করে দেয়। কাঠকাটার অধিকার বলতে বোঝানো হয় জ্বালানীর জন্য এবং ঘর-বাড়ি, বেড়া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মেরামত করার জন্য কাঠ নেওয়ার অধিকার। বনভূমি ছিল গ্রামের সার্বজনীন সম্পত্তি, আর অভিজাতরা সেই বনভূমি অবৈধভাবে গ্রাস করে নিল। এই ঘটনার ফলে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে কৃষকরা। শিকার নিষিদ্ধ করা এবং নদী ব্যবহার করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অভিজাতদের প্রচেষ্টাই চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে উত্তাল জ্যাকেরিজ্-এর [১] (Jacqueries) জন্ম দিয়েছিল। একই ধরণের বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল জার্মানীতেও। যেমন সম্রাট দ্বিতীয় হেন্‌রির বিরুদ্ধে সাক্সনদের সুখ্যাত বিদ্রোহ, এবং লুথার-এর আমলে সুয়াবিয়ান কৃষকদের বিদ্রোহ। যে জমিদাররা তাদের বনাঞ্চল ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল এই সুয়াবিয়ান কৃষকরা। এইসব কৃষক বিদ্রোহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে জমিদারদের বাধ্য করেছিল সার্বজনীনভাবে জমি ব্যবহারের প্রাচীন অধিকারকে মান্য করতে। এইসব অধিকারের মধ্যে ছিল—বেড়া দেওয়া, আগুন জ্বালানো ও যন্ত্রপাতি (বেড়া-বাঁধার উপকরণ, আগুন জ্বালানোর উপকরণ ও চাষের উপকরণ) মেরামতের জন্য কৃষকদের প্রয়োজন মত কাঠ ও ডাল-পালা নেওয়ার অধিকার, এবং সার্বজনীন চারণভূমির অধিকার, অর্থাৎ নিজের গরু, ঘোড়া, শূকর ও কোন কোন ক্ষেত্রে ছাগলকেও একমাত্র যে মাসটা বাদে বাকি সারা বছর সার্বজনীন পশুচারণভূমিতে পাঠানোর অধিকার। এই অধিকারগুলি এতই দৃঢ়মূল ছিল যে লাপয় ত্ত ফ্রেম্যাভিল্ ১৭৬০ সালে ঘোষণা করে দেন—কৃষকরা ঐ অধিকারের

১। জ্যাকেরিজ্ মানে হচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ। Jacques Bonhomme—কৃষকদের সম্বন্ধে এই অপমানজনক উক্তিটা ব্যবহার করত অভিজাতরা। এ থেকেই এসেছে জ্যাকেরিজ্ শব্দটা।

অপব্যবহার করলেও তাদের কাছ থেকে ঐ-সব অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না: "ঐ সব জিনিস ব্যবহারের অধিকার এক চিরন্তন অধিকার। আদি বাসিন্দারা এবং তাদের পরে যারা আসবে—উভয়েই এই অধিকারের অধিকারী। এখনও যারা জন্মায়নি, এমনকি তাদের কাছ থেকেও কোন অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।" কিন্তু কৃষকদের অধিকারের প্রতি এই সামন্তযুগীয় আইনজ্ঞের যে শ্রদ্ধা ছিল, তার কিছুমাত্রও ছিল না ১৭৮৯ সালের বিপ্লবী বুর্জোয়াদের মধ্যে। তাই এই বুর্জোয়ারা স্থাবর সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এইসব অধিকারের বিলোপ ঘটায়।

পতিত জমি ব্যবহারের ব্যাপারে কৃষকদের অধিকারকে জমিদাররা কখনও কখনও মেনে নিতে বাধ্য হয়ে থাকলেও, তারা সর্বদাই বলেছে যে তাদের অনাপত্তিমূলক অনুমতির ফলেই কৃষকরা ঐসব অধিকার পেয়েছিল। কারণ তারা নিজেদেরকে অরণ্যের অধীশ্বর বলে মনে করত, ঠিক যেমন পরবর্তীকালে প্রজাদের জমিকে তারা নিজেদের জমি বলে দাবী করত। মধ্যযুগে কোন (alodial) সম্পত্তিমালিক স্বাধীন নাগরিক যখন নিজেকে জমিদারের হাতে সমর্পণ করতে অর্থাৎ, এক শক্তিমান ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চাইতো, তখন সে ঐ জমিদারকে একটা তৃণময় মৃত্তিকাখণ্ড ভেট দিত, এবং তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার শপথ নিত। তা সত্ত্বেও নিজের জমি কিন্তু তার নিজেরই থাকত। কিন্তু কিছু কিছু প্রদেশে, যেমন ব্রিটানিতে, জমিদাররা নিজেদেরকে মূল জমিটার মালিক বলে মনে করত, তবে মাটির ওপরকার জিনিসগুলিতে, অর্থাৎ শস্য, গাছ, বাড়ি ইত্যাদির ওপর কৃষকদের অধিকারকে তারা স্বীকার করত। এই ধরণের আইনী মিথ্যাচারের সাহায্যেই বুর্জোয়া যুগে অভিজাতরা দখলচ্যুত করেছিল কৃষকদের, যে কৃষকরা ছিল পূর্বতন প্রজাদের বংশধর। স্কট্ল্যাণ্ডে কৃষকদের সম্পত্তির ওপর একেবারে নগ্নভাবে নির্মম লুণ্ঠন চালানো হয়, যার ফলে দেখা দেয় প্রবল জনরোষ। 'ক্যাপিটাল'-এ কার্ল মার্কস বর্ণনা করেছেন কিভাবে সাদারল্যাণ্ডের বকধার্মিক ডাচেস্‌টি কেড়ে নিয়েছিল কৃষকদের অধিকার, যে কৃষকদের পূর্বপুরুষরাই ছিল তার বংশের গৌরব ও মহিমার স্থপতি।

১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লব জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করে। তার আগে পর্যন্ত অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি সহ ফ্রান্সের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তিই সর্বসাধারণের ব্যবহার করার অধিকারের আওতায় ছিল। এই অধিকার পর্যায়ক্রম অনুসারে ঐ-সব সম্পত্তির ব্যক্তিগত চরিত্রকে হটিয়ে দিত। ফসল

তোলা হয়ে যাওয়ার পরই অভিজাতদের অধিকারভুক্ত বনভূমি ও কর্ষণযোগ্য জমিগুলি আবার সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হত, এবং কৃষকরা ঐসব জমিতে অবাধে নিজেদের গরু-ছাগল পাঠাতে পারত। আঙুরের ক্ষেতগুলিতেও এই প্রথা চালু ছিল। ১৮০৬ সালে প্রকাশিত "কৃষি বিষয়ক সফর" গ্রন্থে ফ্রাঁসোয়া-দ্য-নফ্‌শ্যাতু Socie´te´ d' Economic Rurale en Berne কর্তৃক ১৭৬৩ সালে প্রকাশিত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেছেন। ঐ স্মৃতিকথায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল যে "আঙুর সংগ্রহ হয়ে যাওয়ার পর আঙুর-ক্ষেতগুলি মেষচারণের এলাকা হয়ে ওঠে। ঠিক সার্বজনীন জমির মতই এইসব ক্ষেতে চরে বেড়ায় ভেড়ার পাল"। নিজেদের জমিতে গ্রামের গরু-ছাগলের পাল চরানোর অনুমতি দিতে জমিদাররা বাধ্য ছিল তো বটেই, উপরন্তু নিজেদের ইচ্ছামত চাষ করার অধিকারও তাদের ছিল না। আঙুর-লতা রোপন করার আগে বর্ষীয়ানদের পরিষদকে জানাতে ও তাদের অনুমতি নিতে বাধ্য ছিল জমিদাররা। ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছর আগে মঁতেস্ক্যুকে একবার এই অনুমতি দেওয়া হয়নি, যা আর্থ-রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের পক্ষে খুবই লজ্জাজনক হয়ে উঠেছিল। জমির মালিক নিজের জমিকে অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারতেন না। ১৬৯৩ সালে চতুর্দশ লুই এক রাজকীয় আদেশ জারি করেন, যে আদেশে এক প্রাচীন প্রথাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই আদেশে বলা হয় যে মালিক তার জমিতে চাষ করতে অপারগ হলে, "যে কোন লোক ঐ জমিতে বীজ বুনতে ও ফসল তুলতে পারবে।"

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থাবর সম্পত্তি কোনভাবেই বন্ধনহীন ছিল না। নানান বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্ব জড়িয়ে থাকত তার সঙ্গে, তাছাড়াও স্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিল তখন যৌথভাবে সমগ্র পরিবার। কেউ তার নিজের খেয়াল খুশিমত জমি হস্তান্তর করতে পারত না। সে ছিল আসলে এক উপস্বত্বভোগী, সমস্ত সম্পত্তি নিজের বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়াই যার দায়িত্ব। চার্চের ভূ-সম্পত্তিও ছিল এই একই ধরণের। এগুলি ছিল চার্চের, অর্থাৎ মহান ক্যাথলিক পরিবারের সম্পত্তি। যে সব মঠাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী ও যাজকরা এইসব জমি ভোগ-দখল করত, তারা ছিল ঐ জমির পরিচালক মাত্র—একান্তই অবিশ্বস্ত পরিচালক। করের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ফরাসী যাজকরা ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত প্রচার করত যে চার্চের বিষয়-সম্পত্তিকে মামুলী সম্পত্তি হিসাবে বিচার করা উচিৎ নয়। তারা বলত এই সম্পত্তি আসলে কারোরই সম্পত্তি নয়, কারণ এ এক পবিত্র, ধর্মীয় সম্পত্তি। বিপ্লবী বুর্জোয়ারা

ঠিক এই কথাটাকেই কাজে লাগায়। তারা বলে যে যাজকরা চার্চের সম্পত্তির মালিক নয়। চার্চের সম্পত্তিকে বলা হত ecclesiastical সম্পত্তি। এই ecclesia একটি গ্রীক শব্দ, যা থেকে আসে eglise (চার্চ) শব্দটি, যার অর্থ হল সমস্ত বিশ্বস্ত মানুষের জমায়েত, পুনর্মিলন, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমগ্র রাষ্ট্রকেই বোঝানো হয় এই শব্দটি দিয়ে। অতএব, চার্চের সম্পত্তি হচ্ছে আসলে জাতীয় সম্পত্তি। এই ধরণের কৌশলের সাহায্যেই ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেন্‌রির মত বিপ্লবী বুর্জোয়ারা চার্চের সম্পত্তি হস্তগত করে এবং যে সম্পত্তি আসলে দরিদ্র মানুষদের, তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির এইসব বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্বকেই অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন আর্থ-রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা ও উদারপন্থী ঐতিহাসিকরা। আদিম সাম্যবাদের নিদর্শন স্বরূপ এই বাধ্যবাধকতাগুলি কৃষকদের কল্যাণের ব্যবস্থাকেই পাকা করেছিল, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিকে হঠিয়ে দেওয়া মাত্রই তারা এইসব বাধ্যবাধকতা পরিত্যাগ করে।

১৭৮৯ সালের বিপ্লব সম্বন্ধে এক রূপকথা উদ্ভাবন করেছেন বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা—এই বিপ্লব নাকি কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিয়েছিল, আর তারই সঙ্গে দিয়েছিল স্বাধীনতা ও সুখ! অথচ একেবারে সরল সত্যটা হচ্ছে যে এই মহান বিপ্লব কৃষকের পতিত জমি ব্যবহার করার অধিকার এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সুপ্রাচীন অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ঠেলে দিয়েছিল সুদখোর ও দালালদের খপ্পরে, একরাশ করের বোঝা চাপিয়েছিল তার ওপর, আর তাকে বাধ্য করেছিল পুঁজি ও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বিরাট বিরাট ভূ-সম্পত্তির খামার মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে।

বুর্জোয়া বিপ্লব কৃষকদের জন্য নিয়ে এসেছিল শুধুই দুর্দশা আর সর্বনাশ। সরকারী লোকগণনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে ফ্রান্সে ৭৮ লক্ষ ৪৬ হাজার জন সম্পত্তি মালিক ছিল। এদের মধ্যে ৩৬ লক্ষ জন এতই দরিদ্র ছিল যে তারা কোনরকম প্রত্যক্ষ কর দিতে পারত না। ফলে, ছোট বড় মিলিয়ে সম্পত্তি-মালিকদের সংখ্যা নেমে আসে ৪২ লক্ষ ৪৬ হাজারে। ১৮৭৯ সালে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেমন—কৃষি-সংক্রান্ত ঋণ, জমিদারদের প্রতি দেউলিয়া আইন প্রয়োগ, দখলচ্যুত করার প্রণালী বিষয়কে আইনের সরলীকরণ ইত্যাদি, এবং কতজন সম্পত্তি-মালিক সেই সুবিখ্যাত ঋণের অংশ পাওয়ার অধিকারী তা স্থির করার জন্য একটি অনুসন্ধান চালানো হয়। গ্যাম্বেটা কর্তৃক পরিচালিত La Republique Francaise পত্রিকা এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।

পত্রিকাটির ১৮৭৯ সালের ২৫-শে আগস্ট সংখ্যায় বলা হয় যে এই ঋণের অংশ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জামিনযোগ্য মাত্র ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার সম্পত্তি-মালিক আছে সারা ফ্রান্সে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ১৮৫১ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে সম্পত্তি-মালিক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ২০ হাজার কমে গিয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে কৃষকদের অবস্থা এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে তাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বুর্জোয়া লেখকরা যে সব ভুল ও মিথ্যা প্রচার করেছেন, তা উন্মোচিত করার জন্য মধ্যযুগীয় কৃষকদের শ্রমের অবস্থার সঙ্গে আধুনিক কৃষি-শ্রমিকদের শ্রমের অবস্থার তুলনা করাই যথেষ্ট। বিগত ৫০ বছরে পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণা এবং বিভিন্ন শহর ও মঠ থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য দলিলপত্রের ভিত্তিতে এই তুলনা করা যেতে পারে।

নর্ম্যাণ্ডির শ্রমজীবি শ্রেণীগুলির অবস্থা বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত গবেষণায় এল. দেলাইল দেখিয়েছেন, শ্রমকারীদের ভাগ্যের সঙ্গে জমিদারের ভাগ্য কিভাবে জড়িয়ে থাকত, কেননা সংগৃহীত ফসলের ওপরেই নির্ভর করত খাজনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেণ্ট জুলিয়েন দ্য ত্যুর্স্-এর সন্ন্যাসীদের প্রজারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ খাজনা দিত, অন্যান্য জায়গার প্রজারা দিত দশ ভাগের এক ভাগ, আবার কোথাও বা বারো ভাগের এক ভাগ দেওয়াই চালু ছিল। অনেকের দিনের গোটা বুর্জোয়া দুনিয়ার তন্নতন্ন করে তল্লাশী চালালে এমন একজন জমিদারেরও দেখা পাওয়া যাবে না যে তার জমিদারীর এলাকায় সংগৃহীত ফসলের বারো ভাগের এক ভাগ, বা এমনকি ছয় ভাগের এক ভাগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থা শুধু যে একটা প্রদেশেই বলবৎ ছিল, তা নয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তে মইস্যাক্-এও খাজনা দেওয়ার এই একইরকম ব্যবস্থা চালু ছিল। ১২১২ এবং ১২১৪ সালের বিধিবদ্ধ আইনে দেখা যায় সে মইস্যাক্ মঠের সন্ন্যাসীরা তাদের জমিতে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এমনকি এক-দশমাংশ ভাগ পেতেন। লাগ্রেঞ্জ-ফস্যা এই বিধিগুলির ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন "কৃষক ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক চুক্তি হত। সন্ন্যাসীরা ফসলের যে অংশটুকু দাবী করতেন, তা কিন্তু খাজনা নয়। এটা নিয়ে আগেই আলাপ-আলোচনা করা হয়েছিল এবং কৃষকরা স্বেচ্ছায় ঐ প্রকার ফসলের ভাগ দিতে

রাজি হয়েছিল।"[১]

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর নর্ম্যাণ্ডিতে আঙুর চাষের সময় জমিদাররা ফসলের মাত্র অর্দ্ধাংশ দাবী করত, আর বাকি অর্দ্ধাংশ পেত কৃষকরা। আজকের দিনের আঙুর-উৎপাদক দেশগুলির কৃষকরা তো তাদের উৎপাদিত মদের স্বাদটুকু চাখ্‌তেও পায় না।

সেণ্ট জার্মেই দ্য প্রেস্-এর মঠের হিসাব-নিকাশের খাতাটি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন গেরার্ড। এটা এক মূল্যবান দলিল। শার্লম্যান্-এর আমল থেকে শুরু হয়েছে এর তথ্যগুলি। এ থেকে আমরা নবম শতাব্দীর ভূমিদাস ও কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারি। মঠের জমিতে কোন ব্যক্তিবিশেষ চাষ করত না, চাষ করত কৃষকদের এক একটা দল। একত্রে বসবাসকারী ২০ থেকে ৩০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে এই দলগুলি গড়ে উঠত। আর তারা যা খাজনা দিত, তা কোন আধুনিক কৃষকের কাছে অসম্ভব রকম কম বলে মনে হবে।

মঠের জমিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত—manses ingenuiles, manses lidiles এবং manses serviles। সেই যুগে জমির কোন না কোন অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতই : জমিদারী চরিত্রের জমি, স্বাধীন জমি অথবা দাস-প্রকৃতির জমি। গেরার্ড হিসাব করে বলেছেন যে কৃষকরা প্রতি একর স্বাধীন জমির জন্য শ্রমে ও জিনিসপত্রে ৫ শিলিং ৬ পেনি, করদজমির জন্য দিত ৮ শিলিং ১ পেনি, আর দাস-প্রকৃতির জমির জন্য ১০ শিলিং করে খাজনা দিত। মঠের জমিতে কর্মরত কৃষকদের নাম থেকে বোঝা যায় যে তারা অধিকাংশই ছিল জার্মান। পরিবার সমেত এই কৃষকদের সংখ্যা মোটেই কম ছিল না—১০ হাজার ২৬ জন। এই বিপুল সংখ্যাটাকে বিচার করলে বোঝা যায় যে এই কৃষকদের অবস্থাটাই ছিল তখনকার কৃষকদের স্বাভাবিক অবস্থা। আজকের দিনে এমন কোন শ্রমিক আছে কি, যে খুশি মনে তার উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া জমিদারটির বদলে নবম শতাব্দীর কোন সন্ন্যাসীকে পেতে চাইবে না,

১ এ. লাগ্রেজ্-ফস্যা। "Etudes Historiques sur Moissac", ১৮৭২ মইস্যাক হচ্ছে তাই এৎগারো বিভাগের একটি ছোট্ট শহর। মধ্যযুগে এই মইস্যাক্ খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল।

এবং একর পিছু ১০ শিলিং-এ দাস-প্রকৃতির জমি পেতে চাইবে না ?[১]

ইংরেজ শ্রমজীবিদের অবস্থাও একইরকম ছিল। 'মধ্যযুগে ইওরোপের অবস্থা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে হালাম্ লিখেছেন, "মূল্যমানের বিষয়টিকে বিবেচনা করলে একটা অপ্রীতিকর মন্তব্য করতেই হয়—তৃতীয় এডওয়ার্ড বা ষষ্ঠ হেন্‌রির আমলে শ্রমজীবি শ্রেণীগুলি, বিশেষত কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমজীবিরা, আজকের দিনের শ্রমজীবিদের তুলনায় জীবনধারণের উপকরণ অনেক বেশি পরিমানেই পেত। স্যার জন কালাম্ বলেছেন যে চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন কৃষক রোজ চার পেন্স করে পেত, যা দিয়ে সে অনায়াসে সপ্তাহে এক কোম্ব (comb) গম কিনতে পারত। কিন্তু আজকের দিনে (১৭৮৪) এক কোম্ব গম কেনার জন্য তাকে দশ বারো দিন প্রচণ্ড খাটতে হয়। কাজেই, ষষ্ঠ হেন্‌রির আমলে এক পাউণ্ড মাংসের দাম দেড় ফার্দিং হয়ে থাকলে—আমার মনে হয় দামটা এরকমই ছিল—যে শ্রমিক দিনে তিন পেন্স বা সপ্তাহে আঠারো পেন্স রোজগার করত, সে তার পরিবারের জন্য ছয় শিলিং কোয়ার্টার দরে এক বুশেল্ গম আর চব্বিশ পাউণ্ড মাংস কিনতে পারত। নানান ধরনের শ্রমজীবিদের কত করে মজুরী দেওয়া হবে, তা পার্লামেন্টের বিভিন্ন আইনে নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩০ সালের 'শ্রমজীবি বিধি'-তে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে ফসল তোলার সময় শস্যকর্তনকারীরা খাবার ছাড়া দিনে তিন পেন্স করে মজুরী পাবে, যা আজকের দিনের পাঁচ শিলিঙের সমান। ১৪৪৪ সালে ষষ্ঠ হেনরীর সময়ে শ্রমজীবি বিধির ত্রয়োবিংশ ধারার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শস্যকর্তনকারীদের জন্য পাঁচ পেন্স এবং নির্মাণকার্যে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিকদের জন্য তিন পেন্স আধ পেনি মজুরী স্থির করা হয়, যা আজকের দিনের যথাক্রমে ৬ শিলিং ৮ পেন্স এবং ৪ শিলিং ৮ পেন্সের সমান। ১৪৯৬ সালে অষ্টম হেনরীর সময়ে বিধির একাদশ ধারার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শস্যকর্তনকারীদের মজুরী আগের মতই রাখা হয়, কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানো হয়। ১৪৪৪ সালের বিধিতে সর্দার ক্ষেত-মজুর বা সর্দার মেষপালকদের মজুরী স্থির করা হয় ১ পাউণ্ড ৪ শিলিং, যা আজকের দিনের প্রায় ২০ পাউণ্ডের-এর সমান; কৃষিকাজে নিযুক্ত সাধারণ ভৃত্যের মজুরী ছিল ১৮ শিলিং ৪ পেন্স, আর তার সঙ্গে তারা পেত মাংস

১ "Polyptique de l' Abbe Irminon on denombrement des manses' serfs et revcnus dc l' Abbaye de St. Germain des pres sous le regne de Coarlemagne." গেরার্ড কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৪৪.

ও মদ। ১৪৯৬ সালের বিধিতে এইসব কাজের মজুরী কিছুটা বাড়ানো হয়েছিল। যদিও পার্লামেন্টের আইনে এইসব মজুরীর হারকে সর্বোচ্চ হার হিসাবেই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল,—যদিও ধরেই নেওয়া যায় যে পার্লামেণ্ট চলতি মজুরী-হার কমাতেই চাইবে, বাড়াতে নয়—তবু, আমার ধারণা, এর থেকে বেশি মজুরীও চালু ছিল। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা সবসময় আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না। এই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে কৃষিকার্যের সেই একান্ত ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় কর্মের স্থান ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত, আর তার ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমে যেতে বাধ্য। প্রায়শই চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য নয়, অদূরদর্শীতার সঙ্গে জিনিসপত্র বাবহারের ফলেই দেখা দিত এইসব দুর্ভিক্ষ। এ-সব দুর্ভিক্ষও মানুষ সহ্য করত। কিন্তু এইসব ব্যাপারকে মেনে নিয়েও আমি এই সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য যে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের সস্তা দর এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারের নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের উদ্ভাবন শ্রমিকদের যতই উপকার করে থাকুক না কেন, পরিবারের ভরন-পোষণ চালানোর ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা তিন-চারশো বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক কমই ছিল।"[১]

১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী বিপ্লব সঙ্ঘটিত হল তখন পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি নিজেকে সেইসব বহুমুখী দায়দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, যে দায়দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাগুলি তার অতীতের সামাজিক যৌথসম্পত্তির অবশেষ মাত্র, এবং এই বাধ্যবাধকতাগুলিই সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিগুলিকে যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হতে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছে।

১। "দ্যা স্টুডেণ্টেস হিস্ট্রি অফ দ্যা মিডল এজ", হেনরি হালাম। উইলিয়াম স্মিথ কর্তৃক উদ্ধৃত। খণ্ড ২, পরিচ্ছেদ ৯, পৃষ্ঠা ৫৬৬-৬৭.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১ বুর্জোয়া সম্পত্তি

আমরা দেখেছি যে বনভূমি, চারণভূমি, এমনকি কর্ষণযোগ্য ভূমি রূপে স্থাবর সম্পত্তি প্রথমে ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর সার্বজনীন সম্পত্তি। গোত্রগুলি যখন মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে ভেঙে গেল, তখন এই স্থাবর সম্পত্তি হয়ে উঠল যৌথ সম্পত্তি। তারপর ভাঙল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এই আধুনিক পরিবারে থাকে পিতা-মাতা আর তাদের সন্তান, এবং কয়েকজন অতিরিক্ত ব্যক্তি, যেমন ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা অথবা কোন বিপত্নীক কাকা বা বিধবা কাকীমা যারা নিজেদের জন্য পাকা ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি, আর এদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য আশ্রয়দাতারা একান্ত লুব্ধ হয়ে থাকে। এই আধুনিক পরিবারের আমলেই স্থাবর সম্পত্তি রূপান্তরিত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে।

অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু ভিন্ন পথে এগিয়েছে। সাম্যবাদী রূপ থেকে শুরু হলেও, অস্থাবর সম্পত্তি অনেক দ্রুতই ব্যক্তিগত রূপে পৌঁছে যায়। গোষ্ঠীগতভাবে বসবাসকারী বন্যদের মধ্যেও অস্ত্র-শস্ত্র ও অলঙ্কারকে ব্যক্তির নিজস্ব বলে মনে করা হয়, এবং প্রায়শই সেগুলি মৃতদেহের সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়।[১]

শ্রমের উপকরণগুলি যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, উপকরণগুলিকে সব যুগেই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখা হত। ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বের যুগে

১ ফ্রেড্‌রিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন—অমরত্বের যে বিষণ্ণ ধারণাটি আজ পর্যন্ত মানবতাকে পীড়ন করেছে, তা ছিল বন্য মানুষদেরই উদ্ভাবন। তারা ভাবতো যে শরীরের মধ্যে আছে একটা বা দুটো আত্মা, আর এই আত্মা ঘুমের সময় ও মৃত্যুকালে শরীর ছেড়ে চলে যায়। ঠিক একইভাবে তারা পশু, গাছ-পালা, এমনকি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা আছে বলে মনে করত, যে আত্মা তাদের অবয়বের বাইরে থাকতেও সক্ষম। তাই কোন যোদ্ধাকে সমাহিত করার সময় তারা তার অস্ত্রশস্ত্রগুলি ধ্বংস করে ফেলত এবং তার পশুগুলিকে হত্যা করত। তাদের ধারণা ছিল যে ঐসব অস্ত্র ও পশুগুলি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সেই অন্য জগতেও যাবে।

ক্রীতদাস ও ভূমিদাসের হাতেই তুলে দেওয়া হত কাজের যন্ত্রপাতি ও ভূমি। তারাই এগুলি ব্যবহার করত এবং কিছুটা নতুন সম্পত্তি সৃষ্টি করত। শ্রমের উপকরণগুলির ব্যক্তিগত উপযোগিতা এগুলির নিজস্ব চরিত্রের কারণে, উদ্ভূত হয়, কেননা শ্রমের উপকরণগুলি আকারে ছোট, দামে কম এবং একজন মানুষই এগুলিকে পরিচালিত করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কারিগরের যন্ত্রপাতিকে কৃষকের ক্ষেতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐ ক্ষেতও আকারে ছোট, দামে কম এবং একজন মানুষই তা ব্যবহার করতে পারে, অর্থাৎ কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যরাই ঐ জমিতে চাষ করতে পারে।
বুর্জোয়া সম্পত্তি আসার পূর্বপর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি বিবর্তনের পথে একদিকে ক্ষুদ্র কৃষক সম্পত্তির রূপ নেয় আর অন্যদিকে নেয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির রূপ। কৃষিই ছিল এই বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। শ্রমের উপকরণ ও শিল্পগত উৎপাদন সংক্রান্ত সম্পত্তির বিবর্তনের চালিকাশক্তি হল বাণিজ্য। মার্কস দেখিয়েছেন যে বিকাশের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌছনোর পর এই সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এবং তার বুর্জোয়া সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে।

যৌথতাবাদী গ্রামগুলিতে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু (রুটি, মাংস, শণ, পশম প্রভৃতি) নিজেরাই উৎপাদন করে । একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই এইসব গ্রামে কারিগরদের (কামার, তাঁতি, দর্জি প্রভৃতি) প্রবেশ করার অনুমতি মেলে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এইসব করিগররা গ্রামের বাইরে বসবাস করে। কিছুদিন ঐখানে বসবাস করার পর, এক বছর এক দিন পরে তারা নাগরিক অধিকার অর্জন করে সার্বজনীন চারণভূমিতে নিজেদের গবাদি পশু পাঠাতে পারে। সার্বজনীন জমির একটা ভাগ পাওয়ার অধিকার হয়। প্রথমদিকে এইসব গ্রামে কোন জিনিস বিনিময় করা হত না। হস্তশিল্পীরা গোষ্ঠীর সেবায় নিযুক্ত গণকর্মী, বাৎসরিক হিসাবে তাদেরকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়া হয় পারিশ্রমিক হিসাবে। তারা শুধু বরাতমাফিক কাজ করে। তাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়, এবং সম্ভব হলে তারা খরিদ্দারের বাড়িতে বসেই কাজ করে। যখন তারা আর গোষ্ঠী-কর্মী রইল না, তখন তাদের কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হত জিনিসপত্র দিয়ে বা তাদের কোন কাজ করে দিয়ে, ঠিক যেভাবে সৈনিকরা পারিশ্রমিক পেত দেশরক্ষার বিনিময়ে। গ্রামগুলি যতদিন আয়তনে ছোট

এবং স্থাবর সম্পত্তির যৌথতাবাদী রূপটি যতদিন বজায় ছিল, ততদিনই বিদ্যমান ছিল শিল্পীর শ্রমের এই আদিম রূপটি। কয়েকটি রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত যে সব গ্রামের ওপর দিয়ে ভ্রাম্যমান বণিকদের গাড়িগুলি যাতায়াত করত, অথবা নদীর মোহনায় বা সমুদ্রের তীরে যে সব গ্রাম অবস্থিত ছিল, সেইসব গ্রামেই প্রথম পরিবর্তন ঘটলো। ঐসব গ্রামে এক একটা সাময়িক বাজার গড়ে উঠল, যে বাজারে পাঠানোর জন্য হস্তশিল্পীরা বিভিন্ন জিনিস তৈরী করত। যেখানেই নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার সুযোগ পাওয়া যেত, সেখানেই তারা দলে দলে হাজির হত। গ্রামের মানুষেরা তাদেরকে বাধা দিত না বা তাদের সঙ্গে উদাসীন আচরণও করত না, বরং তারা কারিগরদের স্বাগত জানাত। পরবর্তীকালে শহর ও নগরে রূপান্তরিত হয়েছিল যে গ্রামগুলি তার বাসিন্দারা ছিল সুদক্ষ হস্তশিল্পী। এরা নানারকম হস্তশিল্পে নিযুক্ত ছিল এবং একে অপরের প্রয়োজনে পাশে যেয়ে দাঁড়াত। এইসব গ্রামের বাসিন্দারাই গড়ে তুলেছিল এক স্থায়ী বাজার। এই বাজারে তারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করত কিম্বা মেলার সময় আগত ভ্রাম্যমান বণিকদের কাছে ঐসব দ্রব্য বিক্রি করত।

অতঃপর এই শিল্পের চরিত্রেও একটা পরিবর্তন ঘটলো—কারিগররা আর তাদের খরিদ্দারদের ওপর নির্ভরশীল রইল না। কাজ করার জন্য খরিদ্দাররা কবে বরাত দেবে বা কাঁচামাল পাঠাবে, তার আশায় আর কোন কারিগর বসে থাকত না। সে নিজেই কিছু কাঁচামাল কিনে হাতের কাছে মজুত রাখতে শুরু করল। সে আর খরিদ্দারের হুকুমমাফিক কাজ না করে কাজ করত বাজারে বিক্রি করার জন্য। কারিগরদের উৎপাদক চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হল বণিকসুলভ চরিত্র। সে নিজেই এখন কাঁচামাল কেনে এবং তৈরী মাল বিক্রি করে। নিজের কর্মশালাকে আরও বড় করে তোলে। শিক্ষানবিশ ও দিনমজুর নিয়োগ করে কাজে সাহায্য করার জন্য। এরা তার নির্দেশমত কাজ করে, তার বাড়িতেই থাকে, তার সঙ্গেই আহার করে। এসবের জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন হত, তার পরিমাণ এতই কম যে সেটাকে মার্কস প্রযুক্ত অর্থে পুঁজি বলা চলে না, অবশ্য এই তহবিলকে পুঁজির ভ্রূণরূপ বলে মনে করা যেতে পারে। মধ্যযুগীয় গ্রামগুলিতে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীগত জমিতে নবাগতদের অধিকার বাতিল করতে হয়, ভূমি বণ্টনে তাদের অংশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের জমিগুলি আদি বাসিন্দা ও তাদের বংশধরদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবেই রয়ে যায়। এইসব বাসিন্দারা এক ধরণের পৌর অভিজাততন্ত্র গড়ে

তুলেছিল, আর দেশ জুড়ে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার ফলে গড়ে উঠেছিল সামন্ত অভিজাততন্ত্র। গণতান্ত্রিক সুইজারল্যাণ্ডের কিছু নগরে শহরে এখনও অভিজাততন্ত্র টিকে রয়েছে। আধুনিক আল্‌সটিয়ায় এইসব শহরে অভিজাতরাই বড় বড় উৎপাদককে (manufacturers) পরিণত হয়েছে।

যে শহরে অভিজাতরা জমি ও ক্ষমতা একচেটিয়া ভাবে দখল করে নিয়েছিল, তাদের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করার জন্য হস্তশিল্পীরা গড়ে তুলল সমবায়-সঙ্ঘ (guild)। প্রথমদিকে এইসব সঙ্ঘে স্থানীয় সমস্ত কারিগররাই যোগ দিতে পারত। এইসব সঙ্ঘ হস্তশিল্পীদের শুধু পৌর অভিজাতদের হাত থেকেই রক্ষা করত না, রক্ষা করত পারস্পরিক প্রতিযোগিতার হাত থেকেও। যে বাজারে তারা নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করত, তা ধীরে ধীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বাজার যেহেতু শহরের অধিবাসী আর মেলার ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল, তাই বাজারে যাতে অতিরিক্ত পরিমাণ মাল না জমে যায়, তার দিকে নজর রাখতে বাধ্য ছিল সঙ্ঘগুলি। এইসময় সঙ্ঘগুলিতে সকলের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্ঘে যুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে শহরের মধ্যে দোকান খোলার অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাও স্বভাবতই কমে গিয়েছিল। একইভাবে সীমিত হয়ে গিয়েছিল মালিক কর্তৃক নিয়োগযোগ্য দিন-মজুরের সংখ্যা এবং তাদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ। কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে তা যাতে উৎপাদন সঙ্ঘের কার্যকরী পরিষদ ঠিক মতো তত্ত্বাবধান করতে পারে তার জন্য কারিগর-প্রধানরা তাদের ঘরের দরজা-জানালা খুলে রেখে এবং কখনও কখনও উন্মুক্ত জায়গায় কাজ করতে বাধ্য ছিল। প্রত্যেকটি গিল্ড বা সঙ্ঘের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকত, জুতা-প্রস্তুতকারকরা শুধু নতুন জুতাই তৈরী করতে পারত, পুরনো জুতা মেরামত করা বা তাতে তলি (sole) লাগানো তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঐসব কাজ ছিল মুচিদের সঙ্ঘের এক্তিয়ারভুক্ত।

উৎপাদন করার অধিকারের মতই সযত্নে রক্ষা করা হত বিক্রি করার অধিকারকেও। কোন মেলা চলার সময় বিক্রেতারা যখন-তখন ইচ্ছামতো ক্রেতাকে ডাকতে পারত না। দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ই শুধু ক্রেতাকে ডাকা চলত। ক্রেতা তার দোকানের সীমানা পেরিয়ে গেলে আর তাকে ডাকার বা তাকে বিক্রির জন্য মাল দেওয়ার অধিকার বিক্রেতার থাকত না, কারণ ঐ ক্রেতা তখন পার্শ্ববর্তী দোকানের মালিকের এক্তিয়ারভুক্ত। বাজার যে তখনই যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব বহুবিধ

ও ছোট-ছোট নিয়মগুলি থেকে। পরবর্তীকালে এই সব বাজারের সম্প্রসারণ রূপান্তর এনেছিল উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি সাথে সাথে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল।

হস্তশিল্পগত উৎপাদনে এক অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল। হস্তশিল্পীর মধ্যে দুটি জিনিসের সমন্বয় ঘটতো। একদিকে তার শিল্পের মননগত কাজ অপরদিকে কায়িক পরিশ্রমের কাজ—দুটি কাজই করতে হত তাকে। অথচ, উৎপাদন এবং উৎপাদনের উপকরণগুলি ছড়িয়ে থাকত সারা দেশ জুড়ে। প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি জমিদারী তালুক ও কৃষকদের প্রতিটি গোলাবাড়ি তাদের বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ নিজেরাই উৎপাদন করে নিত। তারা বিক্রি করত শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র-গুলি এবং কিনতো শুধু কয়েকটি বিলাসদ্রব্য। যেহেতু তারা নিত্যব্যবহার্য কোন জিনিসপত্র বাইরে থেকে আমদানী করত না, তাই মধ্যযুগীয় শহর ও প্রদেশগুলি ছিল মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। আর তারই ফলস্বরূপ তারা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে সক্ষম ছিল। এরা পৃথক পৃথক ছোট-খাট বহু রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল, আর সাধারণত এদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত।

উৎপাদনের এই নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতার সঙ্গে মানানসই অর্থনৈতিক তত্ত্বটি উৎপাদনের স্বনির্ভরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। কৃষিবিদরাই ছিল সমান্ততান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক তত্ত্ববিদ। ভূ-সম্পত্তির মালিকদের তারা পরামর্শ দিত নিজেদের এলাকার মধ্যেই সব কিছু উৎপাদন করে নেওয়ার, যাতে করে এলাকার বাইরে থেকে কিছুই না কিনতে হয়। আর দেখা গেছে যে সামন্তপ্রভুদের জমিদারীর মধ্যেই সব কিছু তৈরী করার কর্মশালা থাকত, এমনকি অস্ত্রশস্ত্রও এর থেকে বাদ যেত না।

যে ব্যাপারটি এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল, সেই ব্যাপারটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার বহুদিন পর পর্যন্ত এই তত্ত্বটি টিকে ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালি থেকে ফ্রান্সে আমদানী করা হল রেশম শিল্প। এই শিল্পকে এক একটা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করলে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা না করে রাজকীয় নীতি অনুযায়ী রেশম শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়া হল বিভিন্ন প্রদেশে। গ্রামাঞ্চলে রেশমগুটি চাষের চেষ্টা করা হয়েছিল। রেশম-কীট তুঁতগাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। অথচ ঐসব গ্রামাঞ্চলে তুঁতগাছের চাষ একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই দুরূহ ছিল। বাইরে থেকে যাতে আর তুলো কিনতে না হয়, তার জন্য ১৭৮৯ সালের

বিপ্লবের সময় থেকে তুলোগাছের চাষ শুরু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আখ কেনার জন্য উপনিবেশগুলিকে যে কর দিতে হত, তার হাত থেকেও নিস্তার পাওয়ার কথা ভাবা হয় তখন, আর তার ফলেই আবিষ্কৃত হয় যে বীট-কন্দের মধ্যেও রয়েছে শর্করাজাতীয় উপাদান।

পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন দুর্গের মধ্যেকার যুদ্ধ কমে আসছিল। পরাজিত পক্ষের জমি-জায়গা দখল করে নিত বিজয়ীপক্ষ। যুদ্ধ না হওয়ার ফলে রাজপথগুলিও অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠল। এ-সবের দরুণ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান শুরু হল এবং গড়ে উঠল হস্তশিল্পগত পণ্য উৎপাদনের বড় বড় কেন্দ্র। মূলত ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা পশম দিয়ে বস্ত্র নির্মাণের কাজ চালু ছিল ঘেণ্ট শহরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই ঘেণ্ট শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষেরও অধিক। বাণিজ্যের বিকাশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক শহরের সামাজিক কাঠামোকে।

যে সব শহর শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছিল, সেইসব শহরের হস্তশিল্পীদের সমবায় সঙ্ঘ বা গিল্ডের প্রধানরা দৃঢ়বদ্ধ নিগম (corporation) গড়ে তোলে। এই নিগমে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত শুধুমাত্র জন্মসূত্রে, অর্থের জোরে, বা রাজানুকূল্যে, কিম্বা দীর্ঘদিন শিক্ষানবিশ থাকার পর। কোন সঙ্ঘ-প্রধানের পুত্র অবশ্য বা আত্মীয়রা শিক্ষানবিশ ছাড়াই নিগমে প্রবেশাধিকার পেত। হাতের কাজ শেখার জন্য, ঐ কাজের অনুশীলন করার অধিকার পাওয়ার জন্য এবং পরে অবাধে কাজ করার যোগ্যতা পাওয়ার জন্য অর্থ দিতে হত। যে সব কারিগর নিজেরা স্বাধীনভাবে আর কাজ না করে অন্য কোন মালিকের কর্মশালায় কাজ করছিল, তাদেরকে নিগম থেকে সঙ্ঘ-প্রধানরা বাদ দিয়ে দিত। এতদিন পর্যন্ত হস্তশিল্পীরা সুযোগমত মালিক ও দোকানদার হওয়ার আশা মনে মনে পোষণ করত কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এ ব্যাপারে তাদের সমস্ত সম্ভাবনাই বিলীন হয়ে গেল। নিগমভুক্ত শিল্পগুলিতে ঢুকতে না পেরে এবং নিজেদের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে শত্রুতার দরুণ তারা দিন-মজুরদের বিরাট বিরাট সংস্থা গড়ে তোলে। এই সংস্থাগুলি ছিল একইসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের, আর মালিকদের সঙ্ঘগুলি মূলত স্থানীয়ই ছিল। উৎপাদনের বিকাশের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা এই মালিকরা শিক্ষানবিশ ও দিন-মজুরদের মোকাবিলা করার জন্য হাত মেলাতো পৌর অভিজাতদের সঙ্গে। উন্নতিশীল পৌর অভিজাতদের প্রতি ঈর্ষান্বিত সামন্ত অভিজাতরা প্রায়শই এই শিক্ষানবিশ ও দিন-মজুরদের প্ররোচনা যোগাত, সমর্থন জানাত। মধ্যযুগের প্রতিটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর রক্তাক্ত

হয়েছে দিন-মজুর ও হস্তশিল্পমালিকদের মধ্যেকার সংঘর্ষে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে যাওয়ার পথ আবিষ্কার, আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার, ইওরোপীয় বাজারে আমেরিকান সোনার আমদানী, এবং সাগর অতিক্রম করে অপর পারে বাণিজ্যের সূত্রপাত—এইসব ঘটনা স্থাবর সম্পত্তির মূল্য কমিয়ে দেয়, ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে, নেদারল্যাণ্ডের এবং জার্মানীর বাণিজ্যিক সঙ্ঘভুক্ত শহরগুলিতে উদীয়মান বুর্জোয়াদের উৎপাদনের কাজে এক দারুণ প্রেরণা যোগায়, আর সূচনা করে আধুনিক বিপ্লবের যুগের।[১]

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় সদ্য আবিষ্কৃত দেশগুলিতে লুণ্ঠন শুরু হয়, এবং এই দেশগুলি ইওরোপের শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। শস্য, পনির, সুরা প্রভৃতি আমেরিকায় রপ্তানী করতে শুরু করে ইংল্যাণ্ড।

ঔপনিবেশিক বাজার সৃষ্টি এবং আমেরিকা থেকে সোনা আমদানী—এই দুটি ঘটনা নির্মাণমূলক শিল্পের বিকাশকে আরও দ্রুত করে তোলে। ব্যক্তিহিসাবে অনেকে কারখানা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হয়ে ওঠে। এইসব কারখানাগুলি প্রথমে ছিল কারিগরদের কর্মশালা মাত্র। তফাৎ ছিল দুটি—সাধারণ কর্মশালার থেকে অনেক বেশি কর্মী এখানে নিয়োগ করা হত, এখানে এবং উৎপাদিত হত অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য। এই কর্মশালাগুলি যেহেতু গিল্ডের যাবতীয় নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করেছিল আর হস্তক্ষেপ করেছিল গিল্ড-

---

১। খুব আলোড়ন-জাগানো ও বিস্ফোরক চরিত্রের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকেই বৈপ্লবিক ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করাটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ, সমাজের অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনধারণের অবস্থার ওপর অনেক বেশি বৈপ্লবিক প্রভাবসম্পন্ন অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশের সীমানার অদল-বদল এবং নানা ধরণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও কৃষকদের আচার-আচরণ ও প্রথাগুলি শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত থেকেছে। ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ মিস্টার ফ্যারার বলেছেন যে কৃষকদের কুসংস্কারগুলি হুবহু বন্য মানুষদের কুসংস্কারের মতই। রেলপথ স্থাপনের প্রভাবে এই কিছুদিন ধরে গ্রামের মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। আজকের দিনে অর্থনৈতিক বিষয়টির প্রভাব এত যে বেশি ফ্রান্সে আর সরকার পরিবর্তনের জন্য কামান দাগার দরকার হয় না, পার্লামেন্টের সদস্যদের বিরোধিতাই সরকার পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রধানদের অধিকারে, তাই এগুলিকে শহরে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ ছিল না। সে কারণে এইসব কর্মশালা স্থাপন করতে হত শহরতলিতে বা গ্রামাঞ্চলে অথবা সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এইসব সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরে না ছিল পৌর অভিজাতরা, না ছিল নিগমভুক্ত কোন শিল্প। লণ্ডন ও প্যারিতে এইসব কারখানা তৈরী করা হত শহর-প্রাচীরের বাইরে, ওয়েষ্টমিনস্টার সাউথওয়ার্কে এবং ফ্যবর্গ সঁ্যা আঁতোয়ায়। এগুলি স্থাপন করত ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা বণিকরা, নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও যৌথ-সংস্থার বন্ধনে পিষ্ট গিল্ড-প্রধানরা নয়। আজকের দিনে রেলপথ তৈরী ও তা পরিচালনার কাজ করে থাকে পুঁজি নিয়োগকারী ব্যক্তিরা, গাড়ির কামরা নির্মাণকারী কোম্পানীর প্রধানরা নয়।

নির্মান শিল্প চালু হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিগমগুলি আর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল হস্তশিল্পের গিল্ড-প্রধানরা। কিন্তু কারিগরদের পক্ষেও এই নির্মাণ শিল্প ছিল সমান ক্ষতিকর, যদিও শ্রমকে আরও সুশৃঙ্খল করে তুলে ও আরও বেশি পরিমাণে শ্রম সৃষ্টি করে এবং উচ্চতর বেতনের ব্যবস্থা করে নির্মাণশিল্প আপাতভাবে কারিগরদের উপকারই করেছিল। কারখানাগুলিতে শ্রম-বিভাজন চালু হল। যে কোন শিল্পের যাবতীয় কার্যকলাপ অসম্বদ্ধ ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যেমন, পিন্ তৈরীর কাজ প্রায় কুড়িটা বিভিন্ন ধরণের কাজে ভাগ হয়ে গেল, কুড়িজন সুদক্ষ শ্রমিক এই কাজগুলি করতে শুরু করল। যে কারিগর এতদিন পর্যন্ত নিজের শিল্পের যাবতীয় কাজই জানতো এবং এক এক করে ঐ সবকটি কাজই নিজে হাতে করত, সে এখন হয়ে উঠল শুধু এক ক্ষুদ্রাংশের কর্মী, সারাটা জীবন ধরে তাকে ঐ একটাই কাজ করে যেতে হবে।

বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদনে যে জোয়ার এসেছিল, তা শহরগুলির সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে। নিজেদের সীমানা পেরিয়ে সন্নিহিত মাঠে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল শহরগুলি। আর তখন দেখা দিল এক অর্থনৈতিক সমস্যা : এইসব সদ্য-সৃষ্ট জনপদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে উঠল।

আদিম যৌথতাবাদী যুগে এমনকি রাজকীয় ক্ষমতাবিশিষ্ট সামরিক প্রধানদের বাসস্থান হিসাবেও কোন শহর গড়ে ওঠেনি। ঠিক ভারতবর্ষীয় রাজাদের মতই মেরোভিঞ্জিয়ান রাজারাও বেশ কিছু সশস্ত্র অনুচর ও লোক-লস্কর নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, পিছনে পিছনে যেত বিভিন্ন কাজের কারিগররা। রাজারা যেখানেই তাঁবু ফেলতেন, সেখানটাই সাময়িকভাবে শহর হয়ে উঠত। আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের দেওয়া কর ও অনুদানের টাকায় তাঁদের ব্যয় নির্বাহ হত। যে সব

লোকের অন্নসংস্থানের কোন উপায় ছিল না, তারা রাস্তাঘাট না থাকার ফলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্তার দরুণ কখনোই নিজেরা স্থায়ীভাবে একজোট হতে পারত না। জীবনধারণের জন্ত আশপাশের অঞ্চলগুলির কৃষিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল সামন্ততান্ত্রিক শহরগুলি সীমিত সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল। যতদিন পর্যন্ত রাস্তাঘাট ছিল না বা রাস্তায় নিরাপত্তার অভাব ছিল, ততদিন পর্যন্ত শহরগুলির মধ্যে যে কোন ধরণের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল একান্তই অসম্ভব বা দুরূহ। আর তার ফলে জীবনধারণের উপকরণ রপ্তানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু যখন থেকে যোগাযোগের উপায় উন্নত হতে শুরু করল এবং মানুষরা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শস্য চালান দিতে শুরু করল, তখন থেকেই সমস্ত শহর ও প্রদেশগুলি নিজেদের এলাকা থেকে শস্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করা ও শস্য ব্যবসা একচেটিয়াকরণে প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে লাগাল। ইওরোপের সমস্ত শহরেই খাদ্যশস্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে বিক্রি করার বিধান জারি করা হয়েছিল। একটা সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়া হত, এবং কতটা পরিমান খাদ্যশস্য কেনা চলবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। কোন মালিক দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে শস্য মজুত করে রাখলে তার শস্য বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হত। ক্ষেতের অকর্তিত ফসল বা গোলাজাত শস্য ক্রয় করাও নিষিদ্ধ ছিল। শহরগুলির সম্প্রসারণ এবং নিজেদের এলাকার বাইরে থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার সমস্যার ফলে একটা ব্যাপার ঘটতো—চাষ যে বছর ভাল হত না, সে বছরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। শহরের অন্তত তিনমাস চলার মত খাদ্যশস্য মজুত রাখার সবরকম ব্যবস্থা করত পৌর কর্তৃপক্ষ, এবং প্রতিবছর যথেষ্ট পরিমান জমিতে বীজ বপন করা হচ্ছে কিনা, তার দিকেও নজর রাখত। ফ্রান্সে ১৫৭৭ সালের এক অনুশাসনে আঙুর-চাষের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। আঙুরচাষ তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঐ অনুশাসনে বলা হয় যে যতটুকু জমিতে আঙুরের চাষ করা হবে, তার থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে করতে হবে খাদ্য শস্যের চাষ।

নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্ত কৃষির বিকাশ ঘটানোর দরকার হয়ে পড়লো। নতুন সব জমিকে কৃষির আওতায় আনা হল, গাছপালা কেটে সাফ করা হল বনভূমি, জলাজমির সংস্কার করা হল, আর শস্যক্ষেত্রের আয়তনও বাড়ানো হল। যে বছর ভাল চাষ হত, সে বছর এত প্রচুর পরিমাণে ফসল উঠত যে তার দাম থেকে কিছুই লাভ করা যেত না। তাই নতুন বাজার সৃষ্টি করা

অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। ফ্রান্সে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শস্য চালান দেওয়ার এবং ইংল্যাণ্ডেও উপনিবেশগুলিতে শস্য রপ্তানী অনুমতি দেওয়া হল। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাগুলি ছিল ক্ষণস্থায়ী কারণ কোন অঞ্চলে শস্যের দাম একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌছনো মাত্রই সেখানে শস্য রপ্তানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হত। ১৬৬৯ থেকে ১৬৮৩, এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে নয় বার শস্য রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হয়, আর ছয় বছর শস্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এইসব আইন-কানুনের ছিল না। বরং যে সব প্রদেশে সুপ্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়েছে, সেখান থেকে শস্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করে এইসব আইন-কানুন দুর্ভিক্ষকে আরও তীব্রই করে তুলতো। যখনই প্রতিযোগিতার বিপদ দেখা দিত বা ঘনিয়ে আসত দুর্ভিক্ষ, তখনই ঐসব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে পরিবহনের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত শহরগুলি ঐসব শস্য বাজেয়াপ্ত করে নিত। কলবার্ট ২৫০০ বস্তা শস্য দখল করার জন্য বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বোর্দোর পার্লামেণ্ট ঐ শস্যগুলি নিজেদের কাছে রাখতে চেয়েছিল। কখনও কখনও এমনও হত যে কোন শহরে যখন দুর্ভিক্ষ চলছে, তখন মাইল পঞ্চাশ দূরের কোন অঞ্চলে হয়ত অঢেল গম পাওয়া যাচ্ছে। মদ, পশম প্রভৃতির আমদানী-রপ্তানীর ওপরেও একই ধরণের নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছিল। নিজেদের মদ যাতে আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি করা যায়, তার জন্য বোর্দো ও মার্সেই-এর মত সামুদ্রিক বন্দরগুলি পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের মদ জাহাজে তোলার কাজে তারা বাধা দিত। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের আগে রাজ-সভার শেষ মন্ত্রীরা এইসব আইন-কানুনের বিপদ ও অকার্যকারীতা দেখানর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সাময়িকভাবে এইসব আইন রদ করতে সমর্থ হলেও সর্বদাই শেষপর্যন্ত এগুলিকে আবার চালু করতে বাধ্য হতেন। এইসব আইনের বিলোপ ঘটানোর জন্য এবং কৃষকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়ার জন্য দরকার ছিল একটা বিপ্লবের। এইসব সুযোগ-সুবিধা স্থাবর সম্পত্তির ওপর গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত করছিল আধুনিক কৃষির বিকাশকে, ঠিক যেমনভাবে নিগমগুলির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল শিল্পের বিকাশকে।

নিগমভুক্ত শিল্পগুলি তাদের শহরে নতুন নির্মাণশিল্প প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করত। এরা সবথেকে ভয় পেত নতুন নতুন আবিষ্কারকে। হস্তশিল্প মালিকদের মধ্যে শিক্ষাগত সমকক্ষতা বজায় রাখার জন্য এবং একজনের যে সুবিধা নেই

তা যাতে অন্য কেউও ভোগ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য যে কোন ধরণের নতুন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতিকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরগাঁদ দুটি বায়ু-প্রবাহ (air-current) বিশিষ্ট এক ধরণের বাতি উদ্ভাবন করেন। এই বাতি তেলের প্রজ্বলন ক্ষমতাকে তিনগুণ বর্দ্ধিত করেছিল। টিন শ্রমিকদের নিগম এই বাতির উদ্ভাবক আরগাঁদকে প্যারির পার্লামেন্টের সামনে হাজির করিয়েছিল। এই নিগমের দাবী ছিল যে বাতি নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র তাদেরকেই দিতে হবে। মহামান্যা প্যাঁপাদু, দ্যু বারি ও মারি আঁতোয়ানেৎ—রাজসভার এইসব রাজকীয় সদস্যাদের প্রভাবেই সুতির ছাপা কাপড় বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রুয়েন্, লিওঁ এবং আমিয়েঁর বণিক্‌সঙ্ঘ এ ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারা বলেছিল যে এইসব কাপড় তৈরী শুরু হলে ফ্রান্সের শিল্প ধ্বংস হবে এবং সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।

কৃষি ও শিল্পের বিকাশকে বাধা দিত যে সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলগুলি, সেগুলি ভেঙে পড়ার পরই বুর্জোয়া সম্পত্তি নিজেকে অবাধে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে এবং শুরু হয় তার বিবর্তন।

নিজের ভূসম্পত্তির চারদিকে বেড়া দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিল জমিদাররা। ফসল তোলা হয়ে যাওয়ার পর মাঠে মাঠে পশুচারণের যে অধিকার ছিল মানুষের, তা আর রইল না। এই বেড়া দেওয়ার অধিকার এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা তার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষ চাষের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত, জমিদারকেও সেই পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে হত, এবং বেদনার্ত হৃদয়ে তাকে দেখতে হত যে তার জমির ফসলের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের গবাদি পশুগুলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এই বেড়া দেওয়ার অধিকার নিয়েই সবথেকে বেশি হৈ-চৈ হয়েছিল। সম্ভবপর প্রতিটি জায়গায় সার্বজনীন জমি ভাগাভাগি করা হয়, অর্থাৎ তুলে দেওয়া হয় বুর্জোয়াদের হাতে, কারণ গোষ্ঠীর যে সব অধিবাসী ঐ জমির ভাগ পেয়েছিল, তারা নামমাত্র দামে নিজের ভাগ বিক্রি করে দেয় বুর্জোয়াদের কাছে। জমির এই ভাগাভাগির সপক্ষে বিস্তর হিতোপদেশ ও নৈতিক কারণ খাড়া করা হয়, কিন্তু আসলে এই ভাগাভাগি ছিল ক্ষুদ্র কৃষককে কোন গবাদি পশু রাখতে না দেওয়ার এবং তার যাবতীয় সংস্থান কেড়ে নেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের মজুরী-শ্রমিকে পরিণত করা। চার্চের সম্পত্তি ছিল আসলে দরিদ্র মানুষদের সম্পত্তি। কিন্তু তাদের হাতে ঐ সম্পত্তি প্রত্যর্পন

করার বদলে ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে চরম নির্মমতার সঙ্গে শক্তিপ্রয়োগ ও কৌশলের সাহায্যে লুণ্ঠন করে নেওয়া হয় চার্চের সম্পত্তি। সব জায়গার বুর্জোয়াদের মধ্যেই এক তস্করসুলভ প্রবৃত্তির তাড়না লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগের কৃষিজীবি শ্রেণীগুলির ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিওপোল্ড দেলাইল্‌ লিখেছেন: "এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ বিগত পাঁচশত বছর ধরে, আমাদের কৃষির নিশ্চল অবস্থা। আমাদের প্রাচীন রচনাপত্রে যে সব প্রথার কথা পাওয়া যায়, তার প্রায় সবকটিই বর্তমান দিনের শ্রমিকদের মধ্যেও এত বেশি করে চালু আছে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন কৃষক আজকের দিনের ছোট ছোট খামারগুলি দেখলে আদৌ বিস্মিত হবে না।" কিন্তু যে সব বড় বড় আধুনিক আকারে যন্ত্রচালিত কৃষি-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি দেখলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐ কৃষকটিই বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যাবে।

কৃষির সর্বাধিক উন্নত পদ্ধতিগুলি কৃষিজ দ্রব্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িয়েছে। আধুনিক কৃষি এক সর্বনাশা ব্যাপার। একদিকে ফসলের প্রাচুর্য্য আর অন্যদিকে ঐ ফসল বাইরে রপ্তানী করার তাড়না—এই দুইয়ে মিলিয়ে আধুনিক কৃষি নিঃশেষিত করে দেয় মাটির উর্বরতা শক্তিকে। এই ফসল ব্যবহৃত হয় শহরাঞ্চলে, ফলে বাধা পড়ে সঞ্চালনের কাজে। এই সঞ্চালন আগে চলত মাটি, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে। মানুষ ব্যবহার করত মাংস, শস্য, ফলমূল ইত্যাদি, আবার মানুষ ও জীবজন্তুরা বিষ্ঠার রূপে তা ফিরিয়ে দিত মাটিকে। যতদিন পর্যন্ত যেখানে ফসল হত সেখানেই তা ব্যবহার করা হত, ততদিন পর্যন্ত এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া এক সম্পূর্ণ আকার নিত। আজকের দিনের অসম্পূর্ণ সঞ্চালনের প্রতিকার হিসাবে নানান কৃত্রিম উপায়ে মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হচ্ছে। অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবং নেপোলিয়ঁ যে সব জায়গায় যুদ্ধ করেছিলেন সে সব জায়গা থেকে সার এনে ঢালতে হচ্ছে মাটিতে, দিতে হচ্ছে কৃত্রিম ও রাসায়নিক সার।

আধুনিক কৃষির জন্য প্রচুর পরিমাণ শ্রম দরকার হয়। কিন্তু যত বেশী করে শ্রম দরকার হচ্ছে, শিল্প সমৃদ্ধ শহরগুলি ততই বেশী সংখ্যক শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে দিচ্ছে। বিগত আশি বছর ধরে সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে "চাষের কাজ করার লোক বড় কম।" আর কৃষি-মজুরদের এই দুষ্প্রাপ্যতার ফলেই প্রচুর পরিমাণে শ্রমের উপকরণ সংগ্রহ করার কথা ভাবতে হয়েছিল। চাষের কাজে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। কিন্তু

যন্ত্রপাতি শুধু বড় বড় খামারেই কাজে লাগানো যেত। তাই, যন্ত্র ব্যবহার করার এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা চালু করার পূর্বশত ছিল জমির কেন্দ্রীভবন।

১৮৫৭ সালে মঁসিয়ে লিয়ঁস্ দ্য লাভের্গ কথাচ্ছলে ল'য় (l'oise) বিভাগের একটা খামারের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে ১২৫০ একর জমিতে বীট-কন্দের চাষ হত এবং ৮২৫০ বুশেল গম উৎপন্ন হত। উল্লসিত চিত্তে তিনি লিখেছেন, "এর থেকে বড় কিছু ইংল্যাণ্ডে নেই।"[১]

কিন্তু আমেরিকার প্রচুর উৎপাদনশীল (Bonanza) খামারের তুলনায় এইসব বড় বড় খামার কত তুচ্ছ!

জনৈক আমেরিকান কৃষক মিস্টার ড্যাল্‌রিম্পল্‌ বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ১৮৭৪ সাল থেকে এক অর্থলগ্নীকারী কোম্পানীর ৭৫ হাজার একর জমিতে ছয়টি খামারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। খামারগুলিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেন। প্রতিটি বিভাগে থাকে ২ হাজার একর জমি। এই ২ হাজার একর জমিকে আবার তিনটি করে উপভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি উপ-ভাগে থাকে ৬৫০ একর জমি। একেবারে সামরিক শৃঙ্খলায় ৬০০ জন মজুরের একটি বাহিনী এই ৭৫ হাজার একর জমিতে চাষ করে। ফসল কাটার সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ৫০০ থেকে ৬০০ জন অতিরিক্ত মজুর নিয়োগ করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ফসল তোলা হয়ে গেলেই এইসব লোকদের বরখাস্ত করা হয়। শুধু প্রতি বিভাগে একজন করে সর্দার ও ১১০ জন করে মজুর রেখে দেওয়া হয়। ডাকোটা ও মিনেসোটার কিছু কিছু খামারের খচ্চর ও ঘোড়াগুলিকে শীতকালে ঐ অঞ্চলে রাখা হয় না। জমিতে লাঙল দেওয়া হয়ে গেলেই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে আনা হয় পরের বসন্তে। লাঙল, বীজবপনের যন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে থাকে অশ্বারোহী মিস্ত্রীরা, কোন যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ তা সারানোর জন্য তারা প্রস্তুত। মাড়াই-যন্ত্রে শস্য চালা হয়। এই যন্ত্রগুলি দিন-রাত চালু থাকে। এই শস্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী হওয়ার পর খামারের সন্নিহিত রেলপথে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শস্য চলে যায় ডালাস্ বা বাফেলোয়। মিস্টার ড্যাল্‌রিম্পল্‌ প্রতি বছর ৫ হাজার একর করে চাষের জমি বাড়ান। ১৮০০ সালে এই জমির পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার একর।

ইওরোপের বুর্জোয়ারা কৃষকদের কাছ থেকে সার্বজনীন জমি ও সামন্ততান্ত্রিক

১. Leonce de Lavergue, "L' Agriculuae et la Population" প্যারি, ১৮৫৭.

সুযোগ-সুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া ছাড়াও কর হিসাবে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় রক্ত জল করা পরিশ্রম ও অর্থের বোঝা। এর ফলে কৃষকদের নির্ভর করতে হয় সুদখোরদের করুণার ওপর। এই সুদখোররা তাদেরকে পরিণত করে নামমাত্র মালিকে; যারা আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিশাল বিশাল জমির মালিক ও খামারকারীদের প্রতিযোগিতার সামনে একান্ত অসহায়। এইসব কারণ এবং অন্যান্য আরও কিছু কারণ একত্রে মিলে কৃষককে জমি থেকে হঠানোর কাজ এবং তার সর্বহারায় রূপান্তরিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। আমেরিকায় লগ্নী ভিত্তিক কৃষিকাজ চালানো হয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। এই আমেরিকাতেও অত্যন্তউন্নত কৃষি-সর্বহারাদের দেখা মেলে।

ইংল্যাণ্ডের শস্য-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির কৃষকদের মোটামুটি চারটি বর্গে ভাগ করা যায়ঃ ১) দিন-মজুর বা কৃষি-সর্বহারা; ২) ক্ষুদ্র কৃষক (কৃষি মালিক ও ভাগচাষী), ৩) যে জমি-মালিকরা নিজেদের জমির চাষের কাজ দেখা-শোনা করে; ৪) বড় বড় লগ্নীকারী কৃষক, যারা ইওরোপে যাদের মত কৃষক দেখা যায় শুধু রুমানিয়ার বিভিন্ন অংশে আর রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে।

কৃষকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এমন সব সর্বহারাদের নিয়ে গঠিত, যাদের নিজেদের এক ইঞ্চি জমি বা একটা মেটে কুঁড়েও নেই। যে বিছানায় তারা শোয়, যে চামচ দিয়ে খায়—তার কোনটাই তাদের নিজেদের নয়। মানুষ বলতে তারা বোঝে এমন এক জীব যার কোনরকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, শুধু খাদ্য বা বস্ত্র হিসাবে যেটুকু জিনিস সে সরাসরি ভোগ করে, সেটুকু ছাড়া। যে ক্ষেতে তারা চাষ করে, সেই ক্ষেতে তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান থাকে না, এবং চাষ শেষ হয়ে গেলেই তাদেরকে ঐ ক্ষেত ছেড়ে চলে যেতে হয়। অর্থ-লগ্নীকারী খামারের কর্মাধ্যক্ষরা সব জায়গা থেকে মজুর সংগ্রহ করে। গ্রাম এবং বড় বড় শহরের মজুরদের কাজে নিয়োগ করা হয় দিন, সপ্তাহ বা মাসের হিসাবে। কৃষিকাজে নিযুক্ত এইসব মজুররা তত্ত্বাবধায়ক ও সর্দারদের নির্দেশ মত কাজ করে। এদেরকে খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাদের থাকতে দেওয়া হয়, খেতে দেওয়া হয়, ওষুধ দেওয়া হয় এবং মজুরীও দেওয়া হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে এদেরকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় এক নিয়মিত কৃষি-বাহিনী। এই বাহিনী কাজ করে একেবারে সামরিক শৃঙ্খলা মাফিক। নির্দিষ্ট সময়ে এরা শয্যাত্যাগ করে, আহার করে এবং শুতে যায়। সারা সপ্তাহ মদ্যপান নিষিদ্ধ। শুধু রবিবার দিন তারা স্থানীয় মদের দোকানে গিয়ে মদ্যপান করতে পারে। শরৎকালে চাষের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া

হয়। শীতকালে অল্প কয়েকজন লোককে খামারে রাখা হয়। এরা গবাদি পশুর পরিচর্যা আর খামারের জিনিসপত্র দেখাশোনা করে। বাকিরা শহরে বা গ্রামে ফিরে গিয়ে সুযোগ-সুবিধামত যে কোন কাজ করে পেট চালায়।

শিল্পগত (industrial)ও লগ্নীগত সম্পত্তির রূপান্তরের ফলেই ভূমিগত সম্পত্তির ও তার কৃষি পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছিল। বিভিন্ন কর্মশালা গড়ে তুলেছিল শিল্প, নিয়েছিল নানান বিশালায়তন উদ্যোগ (রেলপথ, সুড়ঙ্গপথ প্রভৃতি)—আদিম সাম্যবাদী যুগের বিরাট বিরাট সাফল্যগুলির পর এত বড় উদ্যোগ আর দেখা যায় নি। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও অর্থ যোগান দিতে গিয়ে গ্রামগুলি একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ল, নিঃশেষ হয়ে গেল কৃষকদের লুকোনো সঞ্চয়।

পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মাত্র কয়েকজন অভিজাত, যাজক ও কারিগর ছাড়া বাকি সমস্ত নাগরিক চাষের মাধ্যমেই নিজেদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করত। বুর্জোয়া দুনিয়ায় ক্রমশঃই বেশি বেশি সংখ্যক মানুষ কৃষিগত শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্পগত ও বাণিজ্যিক কাজে নিযুক্ত হল। আর তখন নিজেদের জীবন-ধারণের উপায়ের জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষদের ওপর।

৩

মধ্যযুগীয় গ্রামগুলি ছিল একেকটি অর্থনৈতিক একক (unit), কারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ধরণের হস্তশিল্পই চালু থাকত গ্রামের মধ্যে। এই অর্থনৈতিক একককে ধ্বংস করেই শুরু হল পুঁজিবাদী উৎপাদন। পুঁজিবাদী উৎপাদন হস্তশিল্পগুলিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করে দেয়, পৃথক পৃথক হস্তশিল্পের জন্য গড়ে তোলে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র। কোন শহর বা প্রদেশ আর তার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। বিশেষ বিশেষ জিনিস তৈরীর জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হয় অন্যান্য শহর বা প্রদেশের ওপর। রেশম শিল্পকে সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে রেশম শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে লিওঁ এবং তার চারপাশে। পশম, শণ ও তুলোর বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত হয় কয়েকটি জেলায়, আর অন্য কয়েকটি জেলায় কেন্দ্রীভূত হয় লোহা, বীট-কন্দের চিনি প্রভৃতির উৎপাদন।

প্রাচীন গোষ্ঠীগত ও প্রাদেশিক এককগুলি ধ্বংস হয়ে গেল, তাদের জায়গায় গড়ে উঠল অন্য ধরণের একক। প্রাচীন এককগুলি ছিল জটিল ধরণের: নিজের

পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকটি শিল্পের সমন্বয়ে কোন শহরে বা প্রদেশে গড়ে উঠত এই প্রাচীন একক। আধুনিক অর্থনৈতিক এককগুলি কিন্তু অনেক সরল প্রকৃতির। এক জায়গায় লোহা বা চিনি, অন্য জায়গায় তুলো বা চামড়া—এইরকম এক একটা শিল্প নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটা আধুনিক একক। ফ্রান্সের মত কোন পুঁজিবাদী দেশ তার ভৌগোলিক গঠন ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভাগে বিভক্ত হয় না। এইসব দেশ বিভক্ত হয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককে—তুলো বা মদ উৎপাদনের জেলা, শস্য-উৎপাদনকারী বা চিনি উৎপাদনকারী অঞ্চল, কয়লা বা রেশম উৎপাদনের কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রতিটি শিল্পগত এককই বিভিন্ন প্রয়োজনের ব্যাপারে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক কোন শিল্প-কেন্দ্রই এক মাস বা এক সপ্তাহ ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, অথচ মধ্যযুগীয় শহরগুলি কারোর সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকত। যেমন ধরা যাক, রুয়েন্ শহর যদি সারা ফ্রান্সকে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানী করে, তাহলে তাকে শস্য আমদানী করতে হয় লী বিউস্ থেকে, গবাদি পশু আনতে হয় উত্তরাঞ্চল থেকে, তেল আমদানী করতে হয় মার্সেই থেকে—এইরকম আর কি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এক বিশাল কর্মশালা, যেখানে সামাজিক উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয় বিশেষ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হলেও পারস্পরিক প্রয়োজনের দরুণ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মধ্যযুগীয় শহরগুলির মত রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাহিদার অন্তঃসম্পর্কই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন হস্তশিল্পগত উৎপাদনের আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ঐক্যকে ধ্বংস করেছে, আর এখন সে ধ্বংস করতে চলেছে তার নিজের সৃষ্ট জাতীয় ঐক্যকেও। জাতীয় ঐক্যের জায়গায় সে নিয়ে আসবে আরও ব্যাপকতর এক ঐক্য, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ঐক্য।

ইংল্যাণ্ডই প্রথম রাষ্ট্র, যে যন্ত্র-ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। বাকি সব দেশগুলি যাতে পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক দেশ হিসাবেই থাকতে বাধ্য হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ইংল্যাণ্ড। শিল্পভিত্তিক দেশের ভূমিকাটা শুধু নিজের জন্যই সংরক্ষিত করে রাখতে চেয়েছিল সে। তার ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন যাবতীয় তুলোর বয়নকার্য শুধু ল্যাংকাশায়ারেই করা হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে শিল্পগত একচেটিয়াকরণের এই অকালোচিত প্রচেষ্টাটি অবশ্য ফলপ্রসূ হয় নি। বর্তমানে আমেরিকা তার নিজের প্রয়োজনের থেকে বেশি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।

আর যে ভারতবর্ষের তুলো শিল্পকে ইংল্যাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই ভারতবর্ষও এখন যন্ত্রের সাহায্যে বয়নকার্য শুরু করেছে। ষোল বছর আগে ভারতবর্ষের বস্ত্র কারখানাগুলিতে মোট ৮৭ হাজার বেল্ তুলো ব্যবহৃত হত। ১৮৮৫ সালে তুলো ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল্।[১]

ভারতবর্ষই তুলো শিল্পের জন্ম দিয়েছিল। সুতির কাপড় প্রথমে আসত কলকাতা থেকে, আর মসলিন আসত মোসুল থেকে। তুলাক্ষেতের সন্নিহিত অঞ্চলে প্রস্তুত ভারতীয় সুতো অচিরেই আবার হানা দেবে ইওরোপীয় বাজারে, এবং একসময় ধ্বংস করে দেবে ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্প ও মহাদেশের তুলা-কেন্দ্রগুলিকে। ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলাজাত দ্রব্য রুয়েন্ ও ম্যাঞ্চেস্টারের তুলাজাত দ্রব্যের স্থান অধিকার করবে। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রনির্মাতাদের আসন্ন পরিণতির কথা চিন্তা করে জনৈক আমেরিকান বণিক দয়ার্দ্রচিত্তে তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন —তোমাদের যন্ত্রপাতিগুলো লুইসিআনায় পাঠিয়ে দাও, ওখানে হাতের কাছে কাঁচামাল পাওয়া যাবে, ফলে বেঁচে যাবে পরিবহণের খরচটা। আমাদের চোখের সামনেই একটা শিল্পের আন্তর্জাতিক স্থানচ্যুতি ঘটে চলেছে। কারখানাগুলিকে নিয়ে আসা হচ্ছে কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষি-কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি। কিন্তু, নিজেরা শিল্প-কেন্দ্র হয়ে ওঠার আগেই ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের কৃষিজ উৎপন্নের দৌলতে ইওরোপকে তাদের মুখাপেক্ষী করে তুলতে পেরেছিল। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুদ্ধ' ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বয়নশিল্পী-দের কর্মহীন করে দিয়েছিল, আর 'স্বর্ণপ্রসবিণী গাছ' অর্থাৎ তুলোর চাষ প্রচণ্ড রকম বেড়ে গিয়েছিল ঈজিপ্টে। এর ফলে ঈজিপ্টের সাধারণ কৃষকরা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং ঐ দেশের অর্থসম্পদ গিয়ে পড়ে রথ্স্চাইল্ড ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মালিদের হাতে।

গম উৎপাদন পৃথিবীর কয়েকটি অংশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড যা শস্য উৎপাদন করত, তাতে তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও রপ্তানী করার জন্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকত। আর আজ সেই ইংল্যাণ্ডকে তার নিজের প্রয়োজনীয় গমের অর্ধেকেরও বেশি আমদানী করতে হয় আমে-রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে। ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে একে অপরের ওপর এবং অর্ধ-সভ্য দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরস্পর-নির্ভরশীলতা ক্রমেই বেড়েই চলেছে।

১। টকাস এলিসন, " গ্রেট ব্রিটেনের তুলো শিল্প", ১৮৮৬।

আগামী দিনে এই পরস্পর-নির্ভরশীলতাই গড়ে তুলবে মানবজাতির রাজনৈতিক ঐক্যের বনিয়াদ, যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে বর্তমান জাতীয় ঐক্যগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর।

৪

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন স্থানীয় ও প্রাদেশিক রাজনৈতিক একক (unit) থেকে অগ্রসর হয়ে গড়ে তুলেছে জাতীয় রাজনৈতিক একক। স্থানীয় ভিত্তিতে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পৃথকীভবনের ফলেই এইসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাই দেখা যায়. নির্মানমূলক উৎপাদন একদিকে তার কর্মশালায় একত্রিত করেছে শ্রমিকদের ও উৎপাদনের উপায়গুলিকে, আবার অন্যদিকে সে চালু করেছে শ্রম-বিভাজন, যা শ্রমের উপকরণগুলিকে পৃথক করে দিয়েছে এবং জীবনভোর একটাই মাত্র কাজ করে চলতে বাধ্য করেছে শ্রমিকদের। কারিগরদের যন্ত্রপাতিগুলি ছিল সংখ্যায় অল্প এবং খুবই সাদামাটা, আর শিল্পগত নির্মানকারকদের যন্ত্রপাতিগুলি জটিল ও বহুবিধ। একটিমাত্র কাজ করে চলা ছাড়া বাকি অন্য সব কাজের ক্ষেত্রে আংশিক কাজের (fractional) শ্রমিক যতই অনুপযুক্ত হয়ে পড়তে লাগল, একই প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান শ্রমের উপকরণগুলিও ততই পৃথকীকৃত হতে লাগল ও বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষভাবে গড়ে উঠল। কোন কোন কারখানায় বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ওজনের চার-পাঁচশ হাতুড়ি দেখা যেত, যার প্রতিটা হাতুড়ি শুধুমাত্র কোন একটা বিশেষ কাজের জন্যই ব্যবহৃত হত। বিশালায়তন যন্ত্রচালিত শিল্প উৎপাদনের কাজকে বন্ধনমুক্ত করেছে। আংশিক কাজের শ্রমিকদের হাত থেকে শ্রমের উপকরণগুলি কেড়ে নিয়ে এই শিল্প সেগুলিকে জুড়ে দিয়েছে ইস্পাত আর লোহায় গড়া একটা কাঠামোর সঙ্গে। এই কাঠামোটাকেই বলা যায় বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের কঙ্কাল, আর তার সঙ্গে যুক্ত ঐ উপকরণগুলি হচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র হচ্ছে এক যান্ত্রিক সমন্বয়।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন আরও একটা সমন্বয়ের জন্ম দিয়েছে।

ঘরোয়া শিল্পে একটা অর্থনৈতিক একক থাকে। যে পরিবারটি কোন কাঁচামাল (পশম, শণ প্রভৃতি) উৎপন্ন করে, সেই পরিবারটিই তা থেকে অন্য কিছু তৈরী করে থাকে। এই এককটি এখন ভেঙে গেলে। একেবারে আদিমতম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দেখা যায় যে কিছু কিছু শিল্প নির্দিষ্ট কিছু ব্যাক্তির করায়ত্ত।

এইসব লোকেরা হচ্ছে ঐ শিল্পের চালিকা শক্তি, যেমন কামার, তাঁতি বা দরজি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে, কোন একটা বিচ্ছিন্ন পরিবারকে নিয়ে আর অর্থনৈতিক একক গড়ে উঠত না, গড়ে উঠত গোটা একটা গ্রাম বা নগরকে নিয়ে। বাণিজ্যের বিকাশ ও শিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে এই বিশিষ্ট শিল্পগুলি অনেক বেড়ে উঠল এবং নির্দিষ্ট কিছু কারিগরই শুধু এইসব কাজ করতে লাগল। এইসব কারিগরদের বিভিন্ন রকমের যৌথ-সংস্থা থাকত।

শহরগুলিতে শিল্পের বিশেষীকরণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন। তাঁতিদের, বস্ত্র-রঞ্জনকারী, চাকা-নির্মাতাদের এবং আসবাব-নির্মাতাদের কর্মশালা স্থাপন করার মধ্যে দিয়েই সূত্রপাত হয়েছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের, আর এইসব কর্মশালার অভ্যন্তরেই ঘটে গিয়েছিল এক বিপ্লব—শ্রম-বিভাজন ও যন্ত্রপাতির বিপ্লব। কিন্তু এই কর্মশালাগুলি—যেগুলি পরবর্তী-বিশাল বিশাল কারখানায় পরিণত হয়েছিল—ছোট ছোট কারিগরদের কর্মশালার মতই রয়ে গেল। এগুলি একটা বিশেষ কোন শিল্পগত প্রক্রিয়ায় অথবা কোন একটা কোন পণ্য ও তার বিভিন্ন প্রকারভেদ উৎপাদনের কাজেই আবদ্ধ থাকত। বয়নকারীরা বয়ন করা ছাড়া আর কিছু করত না, কাটুনীরা (spinner) সুতো কাটা ছাড়া করত না আর কিছু। কিন্তু এই বিশেষীকৃত কর্মশালাগুলি একসময় আর পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রইল না। কিছু কিছু কর্মশালা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলল এক একটি কারখানা। রঞ্জকশালা, কাপড় ছাপার কর্মশালা প্রভৃতি সংস্থাগুলি স্থাপিত হল যন্ত্রচালিত বয়নশিল্প ও সুতো-কাটার শিল্পগুলির আশপাশে, যাতে করে একই পুঁজিবাদী পরিচালন-ব্যবস্থার অধীনে কাঁচামালগুলির শিল্পগত রূপান্তরের সমগ্র প্রক্রিয়াটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শুধু পরিপূরক শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, যথেষ্ট স্বনির্ভর শিল্পগুলিতেও ঘটেছিল এই একত্রীকরণ। এই কেন্দ্রীভবন কিন্তু সবসময় একই অঞ্চলে ঘটেনি। প্রায়শঃই বিভিন্ন কারখানা গড়ে উঠত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে। কারখানাগুলির মধ্যে হয়ত যথেষ্ট দূরত্ব থাকত, কিন্তু একই পরিচালন-ব্যবস্থার অধীনেই এগুলি পরিচালিত হত।

ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড ও ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের মতই 'জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া এইসব জটিল শিল্প সংগঠনের নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। ব্যাঙ্কনোটের কাগজ প্রস্তুত করার জন্য নিজস্ব কাগজ কল, ঐ নোট ছাপার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা ও খোদাইশালা, এবং জালিয়াতি ধরার জন্য ফটোগ্রাফির যন্ত্রপাতি থাকত জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির। বাণিজ্যিক ও শিল্পসমৃদ্ধ শহরে এরা শত শত শাখা অফিস স্থাপন করত। স্বদেশের শহরে ও গ্রামীন ব্যাঙ্ক-মালিকদের

সঙ্গে এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির মালিকদের সঙ্গে এরা সম্পর্কস্থাপন করত। বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই আর্থিক ব্যবস্থা এতই দক্ষভাবে সংগঠিত হয়েছিল যে জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিটি স্পন্দন, তার ছাড় দেওয়ার হারের বাড়া-কমা দেশের দূরতম গ্রামেও অনুরণ তুলত, এবং এমনকি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বাজারেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় নমুনা হচ্ছে 'টাইম্‌স্‌' সংবাদপত্রটি। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর সংখ্যক সংবাদদাতা নিয়োগ করেছে, যারা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পত্রিকাটি যোগাযোগ স্থাপন করেছে ইওরোপের প্রধান প্রধান রাজধানিগুলির সঙ্গে। 'টাইম্‌স্‌' তার নিজের কাগজ নিজেই তৈরী করে নেয়, টাইপ বানায়, আর যন্ত্রপাতির তদারকি ও মেরামতির জন্য সে বেশ কিছু মিস্ত্রিও নিয়োগ করেছে। সে নিজেই তার ষোলখানা বিরাট মাপের পৃষ্ঠার টাইপ সাজায়, মুদ্রণফলক (stereotype) তৈরী করে এবং তা যান্ত্রিক উপায়ে ছেপে প্রকাশ করে। অন্যান্য খুচরো বিক্রেতাদের কাছে কাগজ পৌছে দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব ঘোড়া ও গাড়ি আছে। এখন তার চাই শুধু কাগজ তৈরীর কাঁচামাল পাওয়ার জন্য আফ্রিকার আলফা-ঘাসের ক্ষেত্রগুলি। কোন সন্দেহ নেই যে এটাও সে খুব শিগগিরই দখল করবে। এমন একদিন আসবে, যখন আমেরিকান ও ভারতীয় বস্ত্র প্রস্তুতকারকরা নিজেদের কারখানার পাশে তুলো চাষের খামার তৈরী করবে আর গড়ে তুলবে সুতি থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ বানানোর জন্য কর্মশালা। স্কটল্যাণ্ডের পশমীবস্ত্র প্রস্তুতকারকরা ইতিমধ্যেই লণ্ডনে শাখা খুলেছে। এখানে তারা পশমের রেডিমেড্ পোশাক-পরিচ্ছদ বিক্রি করে থাকে। পুঁজিবাদী শিল্প ঘরোয়া উৎপাদনের অর্থনৈতিক একককে পুনর্গঠিত করে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত যে কৃষক পরিবারটি কোন কাঁচামাল উৎপন্ন করত, সেই পরিবারটিই তা থেকে শিল্পগত দ্রব্য তৈরী করত। অচিরেই দেখা যাবে যে, যে পুঁজিবাদী পরিচালক-গোষ্ঠী কাঁচামাল উৎপন্ন করছে, তারাই তা থেকে নানান শিল্পগত দ্রব্য তৈরী করেছে এবং তা বিক্রি করছে খরিদ্দারদের কাছে।

শ্রম-বিভাজনের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের শ্রমের একক ধ্বংস করেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর সে পুনর্গঠিত করল শ্রমের একককে, কিন্তু শ্রমের এই একক মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে এক "লৌহ-মানব", অর্থাৎ যন্ত্রকে নিয়ে। বর্তমানে পুঁজিবাদী উৎপাদন গড়ে তুলছে উৎপাদনের বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে আছে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ও:

পরস্পর-বিপরীত নানা ধরণের শিল্প। এই অতিকায় দানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ বিশেষ বিশেষ শিল্পগুলি পৃথক পৃথক ভাবে থাকতে পারে, একে অপরের থেকে বহু দূরে অবস্থিত হতে পারে, এবং রাজনৈতিক সীমারেখা ও ভৌগোলিক বাধাও (পর্বত, নদী, বা সমুদ্র) এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। শ্রমের এইসব আন্তর্জাতিক দানবসংস্থা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি উদরস্থ করে, আর সেইসঙ্গেই উদরস্থ করে মানুষের চিন্তা ও পেশী শক্তিকে। এই ধরণের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ।

প্রস্তুতকারী ব্যবস্থা ও কারখানার প্রসারের পাশাপাশি সম্পত্তির মধ্যেও একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তনটি ঘটে সোনা ও রূপোর মাধ্যমে। প্রথমদিকে এই ধাতু দুটিতে ছাপ দিয়ে টাকায় পরিণত করা হলেও এগুলি মূলগতভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রের সম্পত্তিই থাকত। মালিকরা এগুলিকে জমিয়ে রাখত অথবা নিজেদের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করত। ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে আজও অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়াই সোনা-রূপোর অন্যতম প্রধান কাজ। ঐসব জায়গায় বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে সোনা-রূপোকে প্রায় ব্যবহারই করা হয় না, সাধারণত একটি দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যেরই বিনিময় করা হয়। নিজের প্রজাদের বাণিজ্যিক লেন-দেনের খুব একটা ক্ষতি না করেই সামন্ত রাজারা জাল মুদ্রা চালু করতে অথবা মুদ্রায় খাদ মেশাতে পারত। কিন্তু বাণিজ্যিক যুগ শুরু হওয়ার পর সোনা ও রুপো হয়ে উঠল মূল্যের প্রতীক, যাবতীয় পণ্যের স্বীকৃত পরিমাপ। আর এখন এই ধাতুগুলি বৈধভাবে নিজেদের পরিমাণ বাড়ানোর, সুদ নেওয়ার অধিকার পায়। তখনও পর্যন্ত সুদে টাকা ধরে দেওয়াকে অত্যন্ত অসম্মানজনক কাজ বলে মনে করা হত। শুধু কোন বিদেশীকে সুদে টাকা ধার দেওয়া চলত, “যে বিদেশী হচ্ছে শত্রু”—বলেছেন ইহুদীদের কঠোর ঈশ্বর। মুনাফার জন্য টাকা ধার দেওয়ার নিন্দা করতেন পোপ ও তার পরিষদ। এই কাজে যারা আসক্ত ছিল, তাদেরকে লোকে ঘৃণা ও নিন্দা করত। সব ধরণের বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুদখোররা নিজেদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলত। সোনা ও রুপো সঞ্চয়কারী মধ্যযুগের ইহুদীরা নিজেদের প্রিয় ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি সম্পর্ক সম্পূর্ণ সচেতন থেকে রাজা বা অভিজাতদের কোন প্রতিশ্রুতিকেই বিশ্বাস করত না, এবং মূল্যবান পাথর বা ভাল কিছু বাঁধা না রাখলে তারা টাকা ধার দিত না।

বুর্জোয়ারা কুসীদবৃত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল এবং মহাজনী কারবারকে সভ্যতার

এক অত্যন্ত লাভজনক ও সম্মানজনক পেশায় পরিণত করল। অর্থ-বিনিয়োগকারী হিসাবে অন্যের উপার্জনের ওপর বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে বুর্জোয়াদের কাছে আদর্শ জীবনযাত্রা। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিপ্লবের ধর্মীয় প্রকাশের স্বীকৃত প্রতিনিধি কাল্‌ভাঁ যখন ষোড়শ শতাব্দীতে যাবতীয় ঐশ্বরিক গুণাবলীর নামে সুদে টাকা ধার দেওয়াকে বৈধ করে তুলছিলেন, চ্যান্সেলর দিউপ্রা তখন, ১৫২২ সালে, শতকরা ৮ শতাংশ সুদে চিরস্থায়ী অনুদান চালু করে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় ঋণের ভিত্তি রচনা করেন। এই অনুদানকে বলা হত rentes de l' hotel de ville, এই রাষ্ট্রীয় ঋণই বুর্জোয়াদের সঞ্চয়ের ব্যাঙ্ক হয়ে উঠল। যে টাকা তারা ব্যবসায় কাজে লাগাতে পারত না, সেই টাকা তারা গচ্ছিত রাখত ঐ ব্যাঙ্কে। প্রাচীন যুগে জেরুসালেমের মন্দির, জিহোভার বাড়ি এই সঞ্চয়-ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করত—জিনিস-পত্র গচ্ছিত রাখার ব্যাঙ্ক ছিল এগুলি। সারা পৃথিবীর ইহুদীরা নিজেদের মূল্যবান ধাতু এখানে জমা রাখত। কিন্তু এই জমা রাখার ব্যাপারে কোন সুদের প্রশ্ন ছিল না।

রাষ্ট্রীয় ঋণ হচ্ছে এক বুর্জোয়া বিকাশ। ১৭৮৯ সালের আগেকার ফরাসী রাজারা—তখনও তাঁরা সুদ নেওয়া সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন—জরুরী প্রয়োজনে সুদের হার এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক কমিয়ে দিতেন, এমনকি কখনও কখনও বকেয়া টাকা মেটানো মুলতবীও রাখতেন। ইওরোপের অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের অর্থ-বিনিয়োগকারীরাও এইরকম উপস্থিতমত কাজ করত। পাওনাদারদের প্রতি এই ধরণের অভিজাতসুলভ আচরণের প্রতিবাদে বুর্জোয়ারা অবিরাম তীব্র নিন্দা জানাত সামন্ততান্ত্রিক সরকারের কাছে। ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম প্রথম কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় ঋণের অলঙ্ঘ্যণীয়তা ঘোষণা করা এবং এই ঋণকে সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ও সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য পরিবর্তনের উর্দ্ধে স্থাপন করা। তখন থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণ খুব শক্ত ভিতের ওপর গড়ে উঠল। মার্কস বলেছেন, "রাষ্ট্রীয় ঋণ আদিম সঞ্চয়ের এক সর্বাধিক শক্তিশালী লিভারে পরিণত হয়। যেন কোন জাদুকরের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সে নিষ্ফলা অর্থকে দেয় বর্দ্ধিত হওয়ার ক্ষমতা আর এইভাবে ঐ অর্থকে পরিণত করে পুঁজিতে, এবং শিল্পে বা মহাজনী কারবারে অর্থ বিনিয়োগের মধ্যে যে সমস্যা ও ঝুঁকি থাকেই, তা আর থাকে না এই পুঁজির মধ্যে। রাষ্ট্রীয় পাওনাদাররা আসলে বিনিময়ে কিছু না নিয়ে কিছুই দেয় না, কেননা ধার দেওয়া অর্থটা পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় ঋণপত্রে, যা সহজেই বিনিময় করা যায়। হাতে নগদ টাকা থাকলে যা কাজ হত, এই ঋণপত্র দিয়েও তারা ঠিক একই

কাজ করে চলে।"[1] ঠিক যেন শুদ্ধের জন্য দিচ্ছে ব্যাঙ্ক নোট।

রাষ্ট্রীয় ঋণের সূত্রপাত পুঁজিপতিদের জন্য তদবধি নজিরবিহীন এক নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছিল, আর সেই সঙ্গেই বাড়িয়ে তুলেছিল অর্থ লগ্নীকারীদের প্রভাব। এই লগ্নীকারীদের কাছে টাকার জন্য আবেদন জানাতে বাধ্য ছিল সরকার। এই ব্যাপারটার ফলেই পুরনো আমলের রাজারা তাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইহুদীদের মত আচরণ করতে পারত না। মধ্যযুগের ঐ ইহুদীদের টেনে নিয়ে আসা হত আদালতের সামনে, সবকিছু কেড়ে-কুড়ে নিয়ে তাদের ফাঁসী দেওয়া হত। যাইহোক, ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের একশ বছর আগে সমাজে এদের প্রভাব এতই বেশি হয়ে উঠেছিল যে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ভাগ পাওয়ার অধিকার অর্জনের জন্য এই হঠাৎ-ধনীদের সঙ্গে নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকত এমনকি উচ্চতম অভিজাতরাও।

বড় বড় বাণিজ্যিক, শিল্পগত ও কৃষিগত প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, রেল, খাল, বড় মাপের অগ্নিচুল্লী ইত্যাদি যখন এত বেড়ে গেছে যে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের ক্ষমতা আর কুলোচ্ছে না এবং দরকার হচ্ছে একত্রীভূত পুঁজি—তখন, অর্থলগ্নীর দ্বারা অর্জিত ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক কর্তৃত্ব হচ্ছে এক অর্থনৈতিক আবশ্যিকতা। লগ্নীকারীর প্রথম কাজ হচ্ছে পুঁজি সঞ্চয় করা, আর তারপর শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই পুঁজি বণ্টন করা। যন্ত্রচালিত শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোন সমাজে পুঁজির গুরুত্ব নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের ওপর শ্রমের উপকরণ (মার্কসের ভাষায় 'স্থির পুঁজি'), সঞ্চরণশীল পুঁজির পরিমাণ (পরিবর্তনশীল পুঁজি), উৎপাদনের দ্রুততা ও প্রাচুর্য, বাজার থেকে দূরত্ব, মাল বিক্রি ও বকেয়া আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়। এইসব কিছু মিলে অর্থলগ্নীকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে।

কিন্তু, সম্পত্তির চরিত্রকে মূলগতভাবে পরিবর্তিত না করে অর্থলগ্নী, যন্ত্রচালিত শিল্প এবং কৃষির আধুনিক পদ্ধতি বিকশিত হতে পারত না। কাজটি করা যেত সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত রূপ থেকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে পরিবর্তিত করে, সম্পত্তিকে তার আদিম রূপে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে সার্বজনীন করে তোলার সময়কে এগিয়ে এনে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থাবর সম্পত্তি ও ছোট-খাট শিল্পের ব্যবস্থায় সম্পত্তি ছিল তার মালিকের একটা অনুষঙ্গ, ঠিক যেমন কারিগরের অনুষঙ্গ ছিল তার যন্ত্রপাতি।

১. কার্ল মার্কস, "ক্যাপিটাল", পরিচ্ছেদ ৩১.

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ভর করত মালিকের ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর—অর্থাৎ তার মিতব্যয়িতা, সক্রিয়তা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর। একইভাবে, যন্ত্র চালায় যে কারিগর, তার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করত তার কাজের উৎকৃষ্টতা। মালিক অসুস্থ হলে, বৃদ্ধ হলে বা অবসর নিলে যে শিল্পসংস্থার সে আত্মাস্বরূপ, তার ক্ষতি কিছুতেই এড়ানো যেত না। সে এমন এক সামাজিক কর্তব্য পালন করত যার মধ্যে মিশে থাকত যন্ত্রণা আর শাস্তি, লাভ আর পুরস্কার। সেইযুগে সম্পত্তি প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিগত ছিল, আর তাই একটি জনপ্রিয় প্রবচনে বলা হয়েছে: "La proprie'te' est le fruit du travail". কিন্তু আধুনিক উৎপাদন এই অবস্থাকে উল্টে দিয়েছে। পুঁজিপতি এখন আর তার সম্পত্তির অনুসঙ্গ নয়, তার সমৃদ্ধিও নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর আর নির্ভর করে করে না। 'প্রভুর নজরদারি'র আর কোন দরকার হয় না এখন। সমস্ত বড় বড় লগ্নীকারী, কৃষিগত ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি চলে পারিচালক গোষ্ঠির নির্দেশ অনুযায়ী। এই পরিচালকগোষ্ঠীগুলি কম-বেশি সুসংগঠিত, এবং এর সদস্যরা উচ্চ বেতন পেয়ে থাকেন। আধুনিক মালিকদের কাজ হচ্ছে নিজের আয়টুকু পকেটস্থ করা, আর মদ ও মেয়েমানুষের পেছনে সেই টাকা উড়িয়ে দেওয়া। আজকের দিনে উৎপাদকদের—যারা সকলেই মজুরী-শ্রমিক—প্রায়োগিক সংগঠনে মালিকদের কোন সামাজিক কর্তব্য থাকে না। উৎপাদনে এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করার পর মালিকরা এখন অকেজো হয়ে গেছে, এমনকি জনৈক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের মতে—তারা আজ উৎপাদনের উপদ্রব স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

আর্থ-রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ্‌রা, যাঁরা বুর্জোয়া সমাজের সুপ্রচুর বেতনভোগী কৈফিয়ৎ-প্রদানকারী ছাড়া আর কিছুই নন, তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রম-সৃষ্ট বস্তুর ওপর সুদ, জমির ভাড়া, মুনাফা ইত্যাদির আকারে পুঁজি যে কর চাপায়, তা ন্যায্য। এটা দেখাতে গিয়ে তাঁরা দাবী করেছেন যে পুঁজিপতি তার 'মিতাচার', পরিচালন দক্ষতা প্রভৃতির দ্বারা খুবই ফলপ্রসূ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই আপাত-সুন্দর বক্তব্যটিকে যদি কিছু যুক্তি দিয়ে অ্যাডাম্ স্মিথ সমর্থন করতেন তাহলে বড় বড় যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের আধুনিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের ঐ তথাকথিত কার্যকারীতার থেকেও হাস্যকর কিছু উদ্ভাবনের কাজে লেগে পড়ত গিফেন্‌স্, রস্‌চার্স, লেরয়-বলিয় ও আর্থ-রাজনীতির এইরকম অন্যান্য চুনোপুঁটিরা—অবশ্য এইসব উদ্দেশ্যপূর্ণ ওকালতির জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বেতন পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তারা এ কাজে হাত দিত না!

যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন কারিগরদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তাদের পেশাগত দক্ষতা, এবং মজুরী-শ্রমিককে পরিণত করেছে যন্ত্রের দাসে। শিল্পের পুঁজিবাদী সংগঠন পুঁজিপতিকে পরগাছা করে তুলেছে। তাদের এই পরগাছাসুলভ ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়েছে নানান বেনামা কোম্পানী গঠনের মধ্যে। এইসব কোম্পানীর শেয়ার ও দায়-দায়িত্ব, অর্থাৎ সম্পত্তির বুর্জোয়া দলিল, উৎপাদন ও স্টক্ এক্সচেঞ্জকে কোনভাবে প্রভাবিত না করেই দিনের মধ্যে অন্তত বারো বার হাত-ফেরতাই হয়। রথ্স্চাইল্ড, গ্র্যান্টস্, গোল্ডস্ এবং ঐসব দলিলের অন্যান্য লগ্নীকারীরা স্টক্ এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত প্রতারণা আর অন্যান্য আর্থিক কৌশলের দ্বারা, এবং উৎপাদনের বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠানের মুনাফাকে নিজেদের টাকার বাক্সে স্তূপীকৃত করার দ্বারা পুঁজিপতিদের শেয়ার ও ঋণপত্র হস্তগত করে, এবং ঐ পুঁজিপতিদের অপদার্থতা প্রমাণ করে দেয়।

সামন্ত জমিদাররা যখন তাদের পোষ্য ও প্রজাদের নিয়ে সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করত, শান্তির সময় ঐ পোষ্যদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করত, আর শত্রুরা আক্রমণ করলে নিজে অস্ত্রধারণ করে প্রজারদেরকে নেতৃত্ব দিত—তখন সমস্ত অভিজাতরা এক কার্যকরী শ্রেণী হিসাবে বর্তমান ছিল, এবং তাদেরকে কোনভাবেই দমিত করা যেত না। কিন্তু যখন দেশে এক আপেক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, এবং শহর ও নগরগুলি দুর্গে পরিণত হয়ে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে উঠল—তখন আর অভিজাতদের কোন প্রয়োজন রইল না। নিজেদের দুর্গ পরিত্যাগ করে তারা তখন ডিউক্দের, চার্চের, রাজাদের কিম্বা সম্রাটের সভাসদ হয়ে উঠল। এখানে তারা দেশের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এক পরগাছায় পরিণত হল, আর তখন থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাদের ভবিতব্য। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে এই অভিজাতদের যেরকম নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেইভাবে ইওরোপের প্রতিটি দেশে তাদেরকে ধ্বংস করা না হলেও তারা সর্বত্রই নিজেদের সামন্ত-তান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধাগুলি পরিত্যাগ করে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বর্তমানে বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য দেখাবার জন্য—অভিজাতসুলভ হাস্যকর হুঙ্কার প্রকাশ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শাসক শ্রেণী হিসাবে অভিজাতদের আর কোন স্থান নেই। পুঁজি-পতি শ্রেণীর জন্যও এই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। যে দিন থেকে সামাজিক উৎপাদনে পুঁজিপতির ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে, সেদিনই স্বাক্ষরিত হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণীর মৃত্যু-পরোয়ানা। অর্থ-নৈতিক ঘটনাবলীই দিয়েছে এই দণ্ডাদেশ, এখন শুধু শেষ দিনটির প্রতীক্ষা। নিজের শ্রেণীর ধ্বংসের পরও যদি কোন পুঁজিপতি টিকে

থাকে, তাহলে, নিজের শ্রেণীর হারানো গৌরবের কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার যে অদ্ভুত সুযোগটুকু আছে উচ্চবংশীয় অভিজাতদের, সেটুকুও তার থাকবে না। যে যন্ত্র-ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে কারিগরদের, সেই যন্ত্র-ব্যবস্থাই ধ্বংস করবে পুঁজিপতিদের।

৬

মানবজাতির জীবনের প্রথমদিকের অমার্জিত ও সাদামাটা সাম্যবাদকে ধ্বংস করে সভ্যতা এক জটিল ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের উপাদান সৃষ্টি করেছে। ঠিক আদিম কালের মতই আজকের দিনে শ্রম করা হয় সকলে মিলে, এবং শ্রমের উপকরণ বা নিজের শ্রম-সৃষ্ট দ্রব্য—কোনটাই উৎপাদকের নয়। বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীরগুলির মত শ্রম-সৃষ্ট বস্তুকে অবশ্য এখনও সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় না। এ-সব বস্তু এখনও অলস পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, কিন্তু এই পুঁজিপতিদের ধ্বংস এখন শুধু কিছু সময় ও সুযোগের ব্যাপার। সম্পত্তির এই পরগাছারা দূর হলেই সার্বজনীন সম্পত্তি মাথা তুলে দাঁড়াবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের বুকে। আদিম সমাজে শুধু রক্তসম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই সম্পত্তি সার্বজনীন ছিল। জ্ঞাতিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেকার প্রতিটি মানুষই ছিল বিদেশী, শত্রু। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজে জাতি, কুল (race) বা বর্ণভিত্তিক কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে মানব সমাজের সকল সদস্যই হবে সম্পত্তির মালিক। কারণ একই পুঁজিবাদী জোয়ালের চাপে নুয়ে-পড়া শ্রমিকরা উপলব্ধি করেছে যে তারা পরস্পরের দুর্দশার সাথী, বিদ্রোহের সাথী, আর তাই জয়ের পরও তাদেরকে মিলিত হয়েই থাকতে হবে।

সম্পত্তির এই অন্তিম বিপ্লবটি, এই সাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবটি, একান্তই অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়া সভ্যতার অভ্যন্তরেই পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে আদিম কালের মত নানান প্রতিষ্ঠান ও সাম্যবাদী প্রথা।

নিজেদের সামরিক প্রধান ও 'সাচেম্'দের নির্বাচন করার জন্য বন্য ও বর্বররা সার্বজনীন ভোটাধিকারের পদ্ধতি প্রয়োগ করত। এই পদ্ধতি এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একসময় বুর্জোয়া সরকার এই পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছিল, আর এখন তারা এই সার্বজনীন ভোটাধিকারেই রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি বলে ঘোষণা করেছে।

আদিম যুগে বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। বর্তমান সময়ে পৌরাঞ্চলের শিশুদের পড়ানো হয় অবৈতনিকভাবে ও সকলকে একত্রে। কিছু কিছু শহরে

তারা বিনামূল্যে খাদ্যও পাচ্ছে। রেস্তোরাঁগুলিতে শহুরে লোকেরা একসঙ্গেই সুখাদ্য খাচ্ছে, খাঁচায়-বন্দী খরগোশের মত সকলে একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার যদি ঠগবাজি হয়ে থাকে, আমাদের শহরের বাড়িগুলি যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, বাকি সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি কৃত্রিম সাম্যবাদী চরিত্রের হয়ে থাকে এবং এগুলি যাদের উপকার করার কথা বলে, তাদেরই পক্ষে যদি সর্বনাশা হয়—তাহলে তার কারণ হল যেহেতু এগুলি উদ্ভূত হচ্ছে এক বুর্জোয়া সমাজে, এবং শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্যই এগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। তবুও এগুলির প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ : এইগুলিই ধ্বংস করে ব্যক্তিতাবাদী প্রবৃত্তি ও চিন্তাকে এবং আগামী দিনের সমাজের সাম্যবাদী অভ্যাসের উপযোগী করে গড়ে তোলে মানুষকে।

বুর্জোয়া সমাজে সাম্যবাদ সবসময়ই প্রচ্ছন্ন রূপে বিদ্যমান রয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলেই সে প্রবলবেগে সমস্ত বাধা চূর্ণ করে সামনে এগিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হিসাবে নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে সে, কিন্তু কী সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা আগে থেকে নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়।